গবেষণাপত্র সংকলন-৬

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন
ইসলামের সাক্ষ্য আইন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

গবেষণাপত্র সংকলন-৬

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

ইসলামের সাক্ষ্য আইন

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

গবেষণা বিভাগ
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.bjilibrary.com

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

বিআইসি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : রবিউস্‌ সানি ১৪৩০
বৈশাখ ১৪১৬
এপ্রিল ২০০৯

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রচ্ছদ : গোলাম মওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : আশি টাকা মাত্র

Gobesonapatra Sankalan-6 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition April 2009 Price Taka 80.00 only.

www.bjilibrary.com

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

www.bjilibrary.com

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান কর্তৃক প্রণীত **"ইসলামের উত্তরাধিকার আইন"** শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রথমে ত্রিশ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট পাঠানো হয়। অতপর এটি নভেম্বর ৬, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'স্টাডি সেশনে' উপস্থাপিত হয়।

গবেষণাপত্রটির মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ রেখে বক্তব্য পেশ করেন– ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যাপক এ. এন. এম. রাফিকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ. কিউ. এম. আবদুল হাকীম, মুফতী মুহাম্মাদ আবদুল মান্নান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন, ড. আহমদ আলী, ড. নজরুল ইসলাম খান, ড. আ.জ.ম. কুতবুল ইসলাম নু'মানী, মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল্লাহ, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম ও জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া।

www.bjilibrary.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الـحـمـد لله رب الـعـالـمـيـن، والصلوة والسـلام على رسـوله الأمـيـن وعلى اله وأصحابـه أجـمـعـيـن.

১. ভূমিকা

'উত্তরাধিকার' মানে হচ্ছে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদে জীবিতদের অধিকার। ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার বা মীরাস লাভের মূলভিত্তি হচ্ছে জন্মগত সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়তা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا.

অর্থাৎ, "পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের প্রাপ্যাংশ রয়েছে। অনুরূপভাবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও প্রাপ্যাংশ রয়েছে। তা কম হোক অথবা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ।"[১]

ইসলামী শরী'য়াহ্-এর বিধানানুযায়ী মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড়ও রেখে যায় আর তার দশজন ওয়ারিস বর্তমান থাকে, তবে উক্ত বস্ত্র খণ্ডটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত করে ১০ জন উত্তরাধিকারীর মধ্যে হারাহার মত বণ্টন করতে হবে। অবশ্য একজন উত্তরাধিকারী অপর একজন উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে তার প্রাপ্যাংশ খরিদ করে নিতে পারবে।[২]

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। এতে রয়েছে মানব জাতির সার্বিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান। উত্তরাধিকার বিজ্ঞান (Succession Science) ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

---

১. সূরা আন নিসা : ৭।

২. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রা), তাফ্হীমুল কুরআন : সূরা আন নিসার ১২নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

জাগতিক জীবনে অর্থ-সম্পদ হচ্ছে মানব সভ্যতা (Civilization)-এর ভিত বা ফাউন্ডেশন। আল কুরআনে সম্পদের অপচয়ের ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ওয়াছিয়াতের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। যাতে জীবিত ওয়ারিসগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

উত্তরাধিকার বন্টনের বিষয়টি একদিকে যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্যদিকে বিষয়টি খুবই নাজুক ও জটিল একটি বিষয়। মানুষের ত্রুটিপূর্ণ ও সীমিত জ্ঞান দিয়ে এর সুষ্ঠু সমাধান কিছুতেই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও গোত্রের উত্তরাধিকার ইতিহাসই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই সর্ব জ্ঞানী মহান আল্লাহ নিজেই তাঁর নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এ জটিল ও কঠিন বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান পেশ করেছেন। ন্যায় ও ইনসাফের দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপকৃত এ শাশ্বত বন্টননীতি কিয়ামাত পর্যন্ত একই পদ্ধতিতে চালু থাকবে।

ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে পুরুষের তুলনায় নারীর প্রাপ্যাংশ অর্ধেক হবার বিষয়টি মহান আল্লাহর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। অবনত মস্তকে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াটাই ঈমানের দাবী। কোন ঈমানদার ব্যক্তি এ অধিকার রাখে না যে, তার যুক্তিগ্রাহ্য হলেই সে আল্লাহর আইন মানবে, তা না হলে মানবে না। পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক দায়িত্ব বহনের ভার স্ত্রীদের অপেক্ষা পুরুষদের উপর অনেক বেশি অর্পণ করা হয়েছে বিধায় মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে নারীদের অংশ পুরুষদের অপেক্ষা কম রাখাই সু-বিচার পূর্ণ ব্যবস্থা।

আমি এ আইনের পক্ষে শুধু এজন্যে ওকালতী করছিনা যে, আমি ইসলামী আইনে বিশ্বাসী, বরং আমি ইসলামী আইনে এজন্যে বিশ্বাসী যে, আমি এর মধ্যে পরিপূর্ণ ইনসাফ, ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য দেখতে পাই। প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে এ আইনের এক বিন্দু বিরোধ নেই। এসব দেখে আমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, এ সকল আইন-কানুনের রচয়িতা অবশ্য অবশ্যই একমাত্র তিনি, যিনি ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলের একমাত্র অধিপতি এবং যিনি আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী। তাই বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত পথহারা আদম সন্তানকে ন্যায়-নীতি ও ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যপন্থার সুষ্ঠু উপায় পদ্ধতি একমাত্র তিনিই দেখিয়ে দিতে পারেন।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

www.bjilibrary.com

"আপনি বলুন, হে আল্লাহ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী, আপনিই সেসব বিষয়ে আপনার বান্দাহদের মাঝে সঠিক ফায়সালা দিচ্ছেন, যেসব বিষয় নিয়ে ওরা মতভেদ করে আসছিল।"[৩]

মীরাস বণ্টন সংক্রান্ত জটিলতার সুষ্ঠু সমাধান পেশ করার সাথে সাথে মহান আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন :

فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

"এসব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ নিশ্চিতরূপে (সকল ব্যাপারে) ওয়াকিফহাল, মহাবিজ্ঞ"।[৪]

এই বিধানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে তিনি আরো ঘোষণা করেছেন : تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ "এসব (মীরাস বণ্টন সংক্রান্ত আল্লাহর নাযিল করা বিধান) হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা-রেখা"।[৫] কোন মুমিন এই সীমা-রেখা লঙ্ঘন করার অধিকার রাখে না।

যে সমাজে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণ তার পিতার জন্যে মহা বিপদের কারণ ছিল, যে সমাজে কন্যা সন্তানকে জীবিতাবস্থায় সমাহিত করা হত, যে সমাজে নিষ্পাপ কন্যা সন্তানকে তার জন্মদাতা পিতার পক্ষ থেকে নদীতে নিক্ষেপ করা হত, যে সমাজে নারীর উত্তরাধিকারের কোন প্রশ্নই অবশিষ্ট ছিলনা, সে সমাজে ইসলাম নারীকে মাতৃত্বের আসনে মর্যাদার সাথে সমাসীন করে তার উত্তরাধিকারের চূড়ান্ত বিধান নিশ্চিত করেছে।

সুতরাং মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত উত্তরাধিকার আইনকে তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও ইহ্‌সান হিসেবে দ্বিধাহীন চিত্তে অবনত মস্তকে গ্রহণ করে নেয়াই মুমিন হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

২. ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন সরাসরি আল কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে সংগৃহীত। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণ কে কতটুকু অংশ পাবে তা আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবে

৩. সূরা আয্‌যুমার : ৪৬।
৪. সূরা আন নিসা : ১১।
৫. সূরা আন নিসা : ১৩।

www.bjilibrary.com

বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য কিছু সম্পূরক বিষয় হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে। ইসলামের উত্তরাধিকার নীতিমালার কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে বর্ণিত হল :

* ইসলামী বিধান মুতাবিক মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সমুদয় সম্পত্তিই মীরাসের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তি, সাধারণত: দু'ধরনের সম্পত্তি রেখে যায়। (১) তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস-পত্র। যেমন : পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, অলংকারাদি ইত্যাদি। (২) বিষয় সম্পত্তি। যেমন : জমা-জমি, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ী পণ্যসামগ্রী।

প্রাক ইসলামী যুগে এই উভয় প্রকার সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হত না। বরং প্রথম প্রকারের সম্পত্তি কোন কোন জাতি মৃত ব্যক্তির সংগে কবরে রেখে দিত। আবার কোন কোন সম্প্রদায় এইসব একত্র করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিত। আবার কেউ কেউ এগুলো তিন ভাগ করে এক ভাগ মৃতের সংগে দাফন করত, এক ভাগ স্মৃতি হিসেবে রেখে দিত আর এক ভাগ সৎকার কার্যে ব্যয় করত।

ইসলাম এই সকল কু-সংস্কার ও নিরর্থক কাজের কবর রচনা করে এই বিধানের মাধ্যমে যে, মৃত ব্যক্তির গোছল, কাফন, দাফন, ঋণ পরিশোধ ও ওয়াছিয়াত আদায়ের পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকবে (তা যে ধরনের সম্পদই হোক না কেন) সবই ওয়ারিসগণের মধ্যে হিসসা অনুসারে বণ্টন করতে হবে।

* ইসলামের উত্তরাধিকার নীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মীরাস' শুধুমাত্র নিকটাত্মীয়ের হক। যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির কোন নিকটাত্মীয় জীবিত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত দূরবর্তী আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেউই মীরাস পাবেনা। অথচ প্রাক ইসলামী যুগে বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীকে আত্মীয়ের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হত। মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যাকে বঞ্চিত করে তার সমুদয় সম্পত্তি দখল করা হত। ইসলাম এই অন্যায় ও যুল্মের মূলোৎপাটন করে মীরাস শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়দের জন্যে নিশ্চিত করেছে। যার কারণে পিতার বর্তমানে দাদা এবং পুত্রের বর্তমানে নাতী মীরাস পাবে না। অনুরূপভাবে পোষ্যপুত্রও মীরাসের অধিকারী হবে না। (অবশ্য ওয়াছিয়াতের পথ ইসলাম খোলা রেখেছে)। ইসলাম দত্তক প্রথার বিলুপ্তির ঘোষণা দিয়ে কেবল ঔরসজাত সন্তানকেই সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ط ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ط وَاللّٰهُ
يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِ السَّبِيْلَ. اُدْعُوْهُمْ لاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ

www.bjilibrary.com

عِنْدَ اللّٰهِ ج فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ.

"তোমাদের মুখডাকা পুত্রদেরকে তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র বানাননি। এ তো তোমাদের মুখে বলা কথা মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ সেই কথাই বলেন যা প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তিনিই সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। মুখ-ডাকা পুত্রদেরকে তাদের পিতার সাথে সম্পৃক্ত সূত্রে ডাক। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফের কথা। আর তাদের পিতা কে তা যদি তোমরা না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং সাথী"।[৬]

এই হুকুম আসার পর নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর মুখ-ডাকা পুত্র যায়িদকে 'যাযিদ ইবনু মুহাম্মাদ' বলার পরিবর্তে তাঁর প্রকৃত পিতার সম্পর্ক উল্লেখ করে 'যায়িদ ইবনু হারিসা' বলা শুরু হয়ে গেল। আল বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে হযরত 'আবদুল্লাহ্ ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, যায়িদ ইবনু হারিসাকে শুরুতে সকলেই যায়িদ ইবনু মুহাম্মাদ বলে ডাকত। এই আয়াত নাযিল হবার পর তাঁকে সকলে যায়িদ ইবনু হারিসা বলে ডাকতে শুরু করে। উপরন্তু এই আয়াত নাযিল হবার পর নিজের জন্মদাতা ছাড়া অন্য কারো সাথে বংশ স্থাপন করা সম্পূর্ণ হারাম হয়ে যায়।

এখানে আরো জেনে রাখা দরকার যে, কাউকে স্নেহভরে 'বেটা', 'ছেলে' কিংবা 'পুত্র' বলায় কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে কাউকে স্নেহ, ভদ্রতা বা সম্মানার্থে মা, বোন, ভাই ইত্যাদি বলে সম্বোধন করলে কোন গুনাহ্ হয় না। তবে কাউকে এইভাবে মুখ-ডাকার সাথে সাথে প্রকৃত পক্ষেও তাই মনে করা এবং তাকে সে মর্যাদা দেয়া, তার অনুরূপ অধিকার স্বীকার করা নিশ্চয়ই আপত্তিকর ও নিষিদ্ধ।[৭]

* ইসলামের উত্তরাধিকার নীতির আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মীরাস পুরুষ-নারী, বড়-ছোট সকলের হক। প্রাক ইসলামী যুগের আরবে শিশু, নারী ও কন্যা সন্তানদেরকে অংশ দেয়া হত না। বর্তমানকালেও কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ে কন্যা সন্তানের উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। কোন কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল পিতার বড় পুত্রই সমুদয় সম্পদের মালিক হয় এবং

৬. সূরা আল আহযাব : ৪-৫।

৭. সাঈয়্যেদ আবুল 'আলা মাওদূদী' (রা) রচিত তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল্-আহযাবের ৮, ৯, ১০নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

অন্যদেরকে এ থেকে বঞ্চিত করা হয়। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন এসব কুসংস্কারের বিলোপ সাধন করে পুত্র-কন্যা, ছোট-বড় সকল ওয়ারিসকেই মীরাসের অধিকারী করেছে।

* আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে ওয়ারিসের পূর্ণাঙ্গ ও স্বাধীন মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীতে এমন বহু সম্প্রদায় আছে যারা একান্নবর্তী পরিবারে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাদের ধর্মীয় আইনে এরূপ পারিবারিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সকলেই বাধ্য। পরিবারের সদস্যবর্গ তাদের সম্পত্তিতে যৌথভাবে মালিকানা লাভ করে। জমি-জমা, ইমারাত ইত্যাদিতে সবাই অংশীদার থাকে। তাতে কারো স্বতন্ত্র অধিকার থাকে না। কেউ তার অংশ পৃথক করে নেয়ার কিংবা ইচ্ছামত বিক্রি করার অধিকার রাখে না। এরূপ যৌথ মালিকানার আবশ্যিক ব্যবস্থা ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের স্বাধীনতা ব্যাহত করে এবং তাকে নানা রকম সংকটের নিগড়ে আবদ্ধ করে, যা থেকে মুক্তি লাভের কোন উপায় তার থাকে না। ইসলাম এ ধরনের অহেতুক বাধ্যবাধকতা পছন্দ করে না। কাজেই ইসলাম আবশ্যিক যৌথ মালিকানার কু-প্রথাকে বিলুপ্ত করে প্রত্যেককে তার অংশের মালিকানায় স্বাধীন করে দিয়েছে।

সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রত্যেক ওয়ারিস যা লাভ করে সে তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। যৌথ পরিবারের সদস্যরূপে জীবন যাপন করতে সে বাধ্য নয়। এর ফলে প্রত্যেক ওয়ারিস তার অর্থ সম্পদের সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা চালাবার সুযোগ পায়। যার ফলে একদিকে যেমন তার অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়, অপরদিকে সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থিক উন্নতিও সাধিত হয়।

৩. উত্তরাধিকার আইন আল কুরআনের অকাট্য ভাষ্য (نص قطعى) দ্বারা প্রমাণিত

ইসলামী শরী'আতের মৌলিক (BASIC) ভাষ্য দু'রকম :

(ক) অকাট্য প্রমাণভিত্তিক (قطعى) ভাষ্য, (খ) সম্ভাব্য প্রমাণভিত্তিক (ظنى) ভাষ্য।

অকাট্য প্রমাণভিত্তিক (قطعى) ভাষ্য :

এটি এমন বিধান, যা যুগের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হয় না। বরং সর্বযুগে-সর্বদা অপরিবর্তনীয় থাকে। আর এ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রণীত হয়েছে সন্দেহাতীতভাবে। ইসলামে উত্তরাধিকার বিষয়টি অকাট্য

www.bjilibrary.com

প্রমাণভিত্তিক। এ কারণে এ বিধানটি কখনো পরিবর্তিত হবে না, চিরদিন অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকবে।

ইসলামের উত্তরাধিকার বিধান অপরিবর্তনীয় বিধায় বিস্তারিতভাবে প্রণীত হয়েছে। যথা : نصف বা অর্ধাংশ (১/২), ربع বা এক-চতুর্থাংশ (১/৪), ثمن বা এক-অষ্টমাংশ (১/৮), ثلثان বা দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩), ثلث বা এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) এবং سدس বা এক ষষ্ঠাংশ (১/৬)। এ হিস্‌সাগুলো আল কুরআনে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে বিধায় কিয়ামাত পর্যন্ত এ রীতি অপরিবর্তনীয়ভাবে বলবৎ থাকবে।

সম্ভাব্য প্রমাণভিত্তিক (ظنى) ভাষ্য :

এটি এমন বিষয় যা যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে চাহিদানুযায়ী পরিবর্তিত হয়। আর এ বিষয়টি বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রণীত না হয়ে ব্যাখ্যা সাপেক্ষে বিধিভুক্ত হয়। ইসলামী ফিক্‌হ (Law) এর পরিভাষায় এ ধরনের ভাষ্য (نص) কে ظنى বা সম্ভাব্য প্রমাণ ভিত্তিক ভাষ্য বলা হয়। আর ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ এ বিষয়ের ভাষ্যের (نص) গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তের উপর কাজ করে থাকেন। এ বিষয়ের উপর গবেষণা-ইজতিহাদের সুযোগ সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। এর উদাহরণস্বরূপ আল কুরআনের এই আয়াতটি পেশ করা যেতে পারে :

وَ أَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

'আর তোমরা তাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় কর।'[৮]

উক্ত আয়াতে কারীমায় 'শক্তি-সামর্থ্য' বলতে কি বুঝানো হয়েছে, তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। তাই ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের নিবিড় গবেষণা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে এ ধরনের ভাষ্য অকাট্য প্রমাণভিত্তিক আর থাকছে না; বরং সম্ভাব্য প্রমাণভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। এখানে গবেষণা ও ইজতিহাদের দরজা কিয়ামাত পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকবে। কাজেই 'শক্তি-সামর্থ্য' এর অর্থ প্রত্যেক যুগের প্রেক্ষাপটে সময়ের চাহিদানুযায়ী বিবেচ্য হবে। 'শক্তি-সামর্থ্য' দিয়ে উদ্দেশ্য সামরিক শক্তিও হতে পারে। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিও হতে পারে।

---

৮. সূরা আল আনফাল : ৬০

www.bjilibrary.com

আরো একটি দৃষ্টান্ত হলো :

"وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ".

"তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম-সম্পাদন করে।[৯]

"وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ".

এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।"[১০]

এখানে পরামর্শ করার ব্যাপারটি হলো অকাট্য প্রমাণভিত্তিক, কিন্তু পরামর্শ কিভাবে সম্পন্ন হবে এর কোন উল্লেখ নেই। তাই এ বিষয়গুলো শাস্ত্রবিদগণের ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মৌলিক ভাষ্য–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ أَوْلَادِكُمْ - لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.

'আল্লাহ তোমাদের সন্তান সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন : এক ছেলের অংশ দু'মেয়ের সমান'[১১] – অকাট্য প্রমাণভিত্তিক। তাই এখানে গবেষণা বা ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং ভাষ্যটি নিজ অবস্থায় কিয়ামাত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে।

৪. উত্তরাধিকার ও ইসলাম

মহান আল্লাহ তা'আলাই সকল ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক। "لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الاَرْضِ" "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে এ সবকিছুর মালিক আল্লাহ।"[১২] তিনি অত্যন্ত দয়াপরবশে আমাদেরকে মালের মালিকানা দিয়েছেন সাময়িকভাবে। যেহেতু তিনিই আসল মালিক সেহেতু তিনিই এ সিদ্ধান্ত দেবার অধিকারী যে কেউ মারা গেলে তার মালিকানায় যে ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকবে তা তার জীবিত আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কি নিয়মে বণ্টন করা হবে। আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস সাব্যস্ত করেছেন এবং (ওয়ারিস বা উত্তরাধিকার সূত্রে) মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে যার জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন ঠিক সে পরিমাণেরই সে হকদার হবে। মৃতের রেখে

৯. সূরা আশ্ শূরা : ৩৮
১০. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯
১১. সূরা আন্ নিসা : ১১
১২. সূরা আল বাকারা : ২৮৪

www.bjilibrary.com

যাওয়া সম্পত্তি আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার এ নিয়মকে ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় "ফারাইয" (فرائض) বলা হয়।

ইসলামের উত্তরাধিকার নীতিমালা একটি অনন্য সাধারণ বন্টন পদ্ধতি। অন্যান্য বন্টন পদ্ধতির কোনটিতে মৃতের রেখে যাওয়া সম্পদ রাষ্ট্রের নিকট সোপর্দ করা হয় এবং কাজের উপকরণগুলোকে গলাটিপে হত্যা করা হয়। ইসলাম তা কখনো সমর্থন করে না। কোনটিতে আবার মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী করা হয় একমাত্র জ্যেষ্ঠপুত্রকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি অন্যায় ও ভ্রান্ত নীতি। কারণ উত্তরাধিকার শুধু বড় ছেলে সন্তানের জন্য নির্ধারণের মাধ্যমে মালিকানা সীমিত ও স্তিমিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এ মালিকানা বংশানুক্রমে সমাজের উচ্চবিত্তের মাঝে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ফলে এ শ্রেণীর লোকেরা উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কোন পরিবারের একজন মাত্র মালিক হবে এবং অন্যরা বঞ্চিত হবে– এর বিরুদ্ধাচরণ তো দূরের কথা, বরং তারা আগামী প্রজন্মের মালিকানা ও অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে তাড়া করতে থাকে।

ইসলাম মানুষের মালিকানা ও শ্রমের নিশ্চয়তা বিধান করে। কিন্তু সম্পদ ব্যবহারকারীর মৃত্যুর পর সেই সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টিত হয়ে যায়। এতে করে মালিকানার উৎপত্তি অটুট থাকে এবং এ স্বত্ব সর্বদা কেন্দ্রীভূত হওয়া থেকে মুক্ত থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে অত্যাচারী উচ্চবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব না হবার কারণে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে। তাছাড়া মানুষের স্বত্ব ও শ্রমের গতি ধ্বংস এবং সম্পদ অন্যের অধীনে চলে যাবার মাধ্যমে সম্পদের মালিকানা ও শ্রমের উৎসাহ নিধন করার ধারা বা রীতি থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বলবৎ থাকে।

পূর্বে বলা হয়েছে সম্পদের মূল মালিক আল্লাহ তা'আলা। তিনি নিজেই উত্তরাধিকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। সুতরাং উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি হচ্ছে আল কুরআনের বাণী। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ. نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوْفًا.

www.bjilibrary.com

'পুরুষদের জন্য সে মাল সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন এবং স্ত্রীলোকদের জন্যও সে মাল-সম্পদে অংশ রয়েছে বা মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজন রেখে যায়। তা অল্প হোক অথবা বেশি। এ অংশ প্রাপ্তি (আল্লাহ্‌র তরফ থেকে) নির্ধারিত। আর মীরাস বন্টনের সময় যখন পরিবারের লোক এবং ইয়াতীম ও মিসকীন আসবে, তখন সে মাল থেকে তাদেরকেও কিছু দান কর এবং তাদের সাথে ভালো মানুষের ন্যায় কথা বল।'[১৩]

স্যার ডি. এফ. মুল্লা তাঁর রচিত "দি প্রিন্সিপল অব মুহামেডান 'ল'– এ উল্লেখ করেন যে, 'তৎকালে উত্তরাধিকার সম্পর্কিত প্রথা আরবে প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে প্রাক-ইসলামী প্রথার রক্তভিত্তিক ওয়ারিসের অধিকার বহুলাংশেই সংরক্ষিত হয়, তবে ইসলামী আইনে পিতা-মাতা, নারী ও নাবালেগের প্রতি ন্যায্য অংশ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।'[১৪]

তিনি আরো উল্লেখ করেন : "প্রাক-ইসলামী প্রথায় উত্তরাধিকার আইনের ক্ষেত্রে স্ব-গোত্রীয় তথা আসাবাগণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ উত্তরাধিকার ব্যবস্থায় শুধু রক্ত সম্পর্কিত বা স্ব-গোত্রীয় উত্তরাধিকারীগণ মৃতের সম্পত্তি পেতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তার পুত্র, তস্যপুত্র, পিতার পুত্র, তস্যপুত্র এবং পিতা, তস্য পিতা এ ধারার রক্ত সম্পর্কিত ওয়ারিসগণই বন্টন করে নিতো। নাবালেগ নারী, নারীগণের মাধ্যমে সম্পর্কিত কোন ওয়ারিস উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত হতো। সুন্নী (মুসলিম) উত্তরাধিকার আইনে নারী, না-বালেগ ও নারীগণের মাধ্যমে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ উত্তরাধিকার লাভ করে।"[১৫]

৫. ইলমুল ফারাইয

ফারাইয "فرائض" শব্দটি "فريضة" এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে : নির্ধারণ করা, চূড়ান্তরূপে স্থির করা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী ফারাইয মানে হচ্ছে সেসব অংশসমূহ, যেগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা ওয়ারিসগণের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

আর ইলমুল ফারাইয- علم الفرائض -এর সংজ্ঞা হচ্ছে :

১৩. ৪ সূরা আন নিসা : ৭, ৮

১৪. অধ্যক্ষ এ.এ.এম মনীরুজ্জামান : মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি, পৃ. ১০০

১৫. অধ্যক্ষ এ.এ.এম মনীরুজ্জামান : মুসলিম পারিবারিক আইন পরিচিতি, পৃ. ১০০, ১০১

www.bjilibrary.com

علم بقواعد وجزئيات تعرف بها كيفية صرف التركة الى الوارث بعد معرفته.

অর্থাৎ, যেসব নিয়ম-পদ্ধতি দ্বারা মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তি ওয়ারিসগণের মাঝে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা যায়, আর যে বিদ্যা দ্বারা ওয়ারিসগণের পরিচিতি লাভ করা যায় সে বিদ্যা বা জ্ঞানকেই বলা হয় ইলমুল ফারাইয- علم الفرائض।[১৬]

ফারাইযের আলোচ্য বিষয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি, জমিজমা ও তার ওয়ারিস এসবই হচ্ছে ফারাইযের আলোচ্য বিষয়। আর ফারাইযের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র আদালত থেকে পরকালীন মুক্তির জন্য প্রত্যেক ওয়ারিসকে তার নির্ধারিত প্রাপ্য আদায় করে দেয়া।[১৭]

৬. ফারাইয সম্পর্কিত কতিপয় পরিভাষা

* মীরাস (مِيْرَاث) এর অর্থ হচ্ছে : (ক) উত্তরাধিকারী হওয়া, (খ) একজন থেকে অন্যজনের নিকট স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়া, (গ) মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি।

* মুরিস (مُوْرِث) : মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি। (অর্থাৎ যার মৃত্যুর কারণে অন্যরা ওয়ারিস হয়)।

* ওয়ারিস (وَارِث) : জীবিত ঐ ব্যক্তিকে ওয়ারিস বলা হয়, যে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে শরী'আতসম্মতভাবে উত্তরাধিকারী হয়।

* তারিকা (تَرِكَة) : মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তিকে তারিকা تركة বলে।

* যাবিল ফুরূয (ذوى الفروض) : ওয়ারিসদের মধ্যে যে চারজন পুরুষ ও আটজন নারীর প্রাপ্য অংশ আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে তাদেরকে ذوى الفروض বলা হয়।

* আল আসাবাহ (العصبة) : পিতার পক্ষের আত্মীয়কে 'আসাবাহ্ বলা হয়। 'আল্লামা সিরাজী (র:)-এর মতে যে সব উত্তরাধিকারী ذوى الفروض এর অংশ

১৬. মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম : হাল্লু আস সিরাজী (حل السراجى)।

১৭. মুফ্তী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম : (حل السراجى)।

www.bjilibrary.com

বণ্টনের পর অবশিষ্ট সম্পদের ওয়ারিস সাব্যস্ত হয় তাদেরকে 'আসাবাহ্ বলা হয়। 'আসাবাহ্ মোট চার প্রকার। পরে এর বিস্তারিত বর্ণনা আসবে إن شاء الله।'

* আল হুজুব (اَلْحُجُبُ) : কোন উত্তরাধিকারীর মীরাস-এর স্বত্ব হতে অপর কোন ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে حُجُبْ বলা হয়।

* মাখারিজুল ফুরূয (مخارج الفروض) : মীরাস বণ্টনের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের অংশ সমূহ বের করার জন্যে আল কুরআনে ঘোষিত ৬টি সংখ্যাকে مخارج الفروض বলা হয়। সে ৬টি সংখ্যা হচ্ছে النصف। (১/২), الربع (১/৪), الثمن (১/৮), الثلثان (২/৩), الثلث (১/৩) ও السدس (১/৬)।

* আল 'আউল (العول) : উদ্দিষ্ট অংশ নির্ণয়ের সংখ্যাটি অংশ প্রদানের ক্ষেত্রে যদি সংকীর্ণ হয়ে যায়, তবে নির্ণেয় সংখ্যাটির সাথে কিছু বৃদ্ধি করাকে عول বলা হয়।

* আত্ তাছহীহ (التصحيح) : একাধিক ওয়ারিসের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ দেখা দিলে, তখন ভগ্নাংশ ছাড়াই অংশীদারদের অংশ মিল করে দেয়ার জন্যে গাণিতিক নিয়মে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়– তাকে تصحيح বলা হয়।

* আল মুনাসাখাহ (المناسخة) : মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টনের পূর্বেই কোন ওয়ারিসের মৃত্যু হলে তার অংশ তার ওয়ারিসদের নিকট বণ্টন করার পদ্ধতিকে مناسخة বলা হয়।

* যাবিল আরহাম (ذوى الأرحام) : মৃত ব্যক্তির এমন আত্মীয়-স্বজনকে ذوى الارحام। বা রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় বলা হয়, যারা সাধারণত ذوى الفروض বা عصبة এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

এছাড়াও রয়েছে আরো অনেক পরিভাষা। এখানে বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু পরিভাষাই উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. ইলমুল ফারাইযের গুরুত্ব

ফারাইয ইসলামের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মীরাস বণ্টনের বিস্তারিত বিবরণ আল কুরআনে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট থেকেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি উম্মাহকে এ ব্যাপারে জোর তাকিদ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

تعلموا الفرائض وعلموها الناس فانّى امْرءٌ مقبوضٌ وان

العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان فى الفريضة لايجدان من يقضيها.

'তোমরা ফারাইয শিখ এবং মানুষকে শিক্ষা দাও। কেননা আমাকে একদিন বিদায় নিয়ে যেতে হবে। অচিরেই ইল্‌ম তুলে নেয়া হবে এবং নানা প্রকার ফিতনা দেখা দেবে। তখন অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছবে যে, ফারাইয নিয়ে দু'ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে, অথচ তারা এমন কাউকে পাবে না, যে তার ফায়সালা করবে।'[১৮]

عن عمر (رض) قال تعلموا الفرائض وزاد ابن مسعود والطلاق والحج قالا فانه من دينكم.

"উমার (রা) এর বর্ণনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন ঃ 'তোমরা ফারাইয শিখ।' আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বর্ধিত আকারে বর্ণনা করেন, 'তালাক এবং হজ্জের বিধানও শিখ।' উভয় বর্ণনাকারী ফারাইযের ব্যাপারে বলেন যে, কেননা এটি তোমাদের দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।[১৯] উমার (রা) বলতেন ঃ 'তোমরা যেমনিভাবে কুরআন শিখ, তেমনিভাবে ফারাইয শিখ। কারণ এটা তোমাদের দীনের অংশ।' তিনি আবূ মূসা আল আশ'আরী (রা)-কে চিঠির মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমরা যখন আলাপ-আলোচনা করবে, তখন ফারাইয সম্পর্কে আলোচনা করবে।'[২০]

এ পর্যায়ে ইমাম আল বুখারী (রহ) তাঁর সহীহ আল বুখারীতে كتاب الفرائض অধ্যায়ে বহু শিরোনামে ফারাইযের বিভিন্ন মাসআলা মাসায়েল বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ের শুরুতে তিনি باب قول الله يوصيكم الله فى اولادكم الايتين. - অর্থাৎ "আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ওয়াছিয়াত করছেন" এ শিরোনামে জাবির ইবনু আবদিল্লাহর (রা) ঘটনা উল্লেখ করেছেন। জাবির (রা) বলেছেন যে, 'আমি অসুস্থ হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আবু বাকর (রা) আমাকে দেখতে

১৮. মুস্‌তাদ্‌রাকে আল হাকিম, ৪র্থ খণ্ড।

১৯. মিশ্‌কাতুল মাছাবীহ, পৃ. ২৬৫

২০. মুস্‌তাদ্‌রাক, আল বাইহাকী, এর বরাতে ই.ফা.বা প্রকাশনা : ২৩৫৪/১, পৃ. ১২

www.bjilibrary.com

আসেন। আমি বেহুঁশ হয়ে গেলাম। (এ অবস্থা দেখে) রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অযূ করে আমার ওপর অযূর পানি ছিটিয়ে দিলেন। অতপর আমি সুস্থ হয়ে আরয করলাম ঃ

'হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আমি সহায়-সম্পদের ব্যাপারে কি করবো? কিভাবে ফায়সালা করবো?' এ পর্যায়ে মীরাসের আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো জবাব দেননি। (এরই মধ্যে নাযিল হয়ে গেল মীরাসের বর্ণনা সংক্রান্ত আয়াত। তা হচ্ছে : (..... يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ)[২১]

এরপর ইমাম আল বুখারী (রহ) باب تعليم الفرائض নামে ২য় শিরোনামে একাধিক হাদীস উল্লেখ করেছেন। প্রথম হাদীসটি উকবা ইবনু 'আমেরের (রা)। তিনি বলেছেন, 'তোমরা ধারণাপ্রসূত কথাবার্তা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ফারায়েয সংক্রান্ত মাসআলা- মাসায়েল শিখে নাও।'[২২]

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে ধারণা নির্ভর হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন।' ইমাম আল বুখারী (রহ) এ হাদীস দ্বারা একথাই বুঝিয়েছেন যে, ফারাইয ইসলামী আইনের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এ ব্যাপারে সঠিক ইল্‌ম অর্জন করতে হবে। ধারণা নির্ভর হয়ে কোন কথাই বলা যাবে না।

৮. تدوين علم الفرائض (ফারাইয শাস্ত্রের সংকলন)

علم الفرائض ইসলামী ফিক্‌হ (فقه) শাস্ত্রের একটি অন্যতম শাখা। 'ইলমে ফিক্‌হ্ চর্চা ও সংকলনের সময় থেকেই এ শাখাটিরও চর্চা ও সংকলন শুরু হয়। সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের একটি অংশ এ গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রটির সংকলন কাজে হাত দেন। ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হযরত সা'ঈদ ইবনুয্ যুবায়ের, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনুয্ যুবায়ের ইবনুল 'আউয়াম, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর আস-সিদ্দীক, খারেজা ইবনু সা'ঈদ ইবনু সাবিত, 'উবাইদুল্লাহ্ ইবনু 'আবদিল্লাহ্ ইবনু 'উতবা ইবনু মাস'উদ ইবনু সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, আবু সালামা ইবনু 'আবদির রহমান ইবনু 'আওফ,

২১. সহীহ আল বুখারী, পৃ. ৯৯৫

২২. সহীহ আল বুখারী, পৃ. ৯৯৫

www.bjilibrary.com

সালেম ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনুল খাত্তাব, আবু বাকর ইবনু 'আবদির রহমান ইবনু হারিস ইবনু হিশাম (রা) প্রমুখ 'ইলমে ফারাইযের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা ফারাইয শাস্ত্রের চর্চা ও শিক্ষাদান অব্যাহত রেখেছিলেন বলে জানা যায়।

সাহাবী ও তাবে'য়ীগণের ধারাবাহিকতায় ইমাম আবু হানীফা (রহ)- এর যুগে ফারায়েয শাস্ত্রের বিকাশ লাভ করে। এসময় فرائض ابن أبى ليلى এবং فرائض ابن شبرمة সহ কতিপয় গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইমাম শাফে'য়ী (রহ) ও মালিক (রহ)-এর শিষ্যগণও এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের শিষ্যদের প্রণীত كتاب أبى ثور এবং كتاب الكرابين এর নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময় আবুল 'আব্বাছ ইবনু সারীজ যুগশ্রেষ্ঠ ফারাইয গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৯. ফারাইয শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য কতিপয় গ্রন্থ

গ্রন্থের নাম গ্রন্থকারের নাম মৃত্যু

(১) আল্ ফারাইয ইবনুল্লাবান মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ আল মিসরী ৪০২ হিজরী।

(২) আল্ ফারাইয ইবনু 'আবদিল বিরর ইউসুফ ইবনু 'আবদিল্লাহ আল কুরতুবী ৪৬৩ হিজরী।

(৩) আল কাফী ইসহাক ইবনু ইউসূফ ফরযী আল ইয়ামানী ৫০০ হিজরী।

(৪) রায়েদ ফিল ফারাইয মুহাম্মাদ ইবনু 'উমার যারুল্লাহ আয-যামাখশারী ৫২৮ হিজরী।

(৫) আল ফারাইয আবুল কাসিম আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদইবনু খালফ ৫৮০ হিজরী।

(৬) আল ফারাইয 'আঃ রশীদ মুবাশশার ইবনু 'আলী ইবনু আহমাদ আলহাসিব আর রাযী ৫৮৯ হিজরী।

(৭) আল ফারাইয আবুর রাযা মুখতার ইবনু মাহ্মুদ আল হানাফী ৬৫৮ হিজরী।

(৮) রায়েদ ফিল ফারাইয ও আবু গানেম মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আহমাদ ইবনু 'আদীল ৬৯৯ হিজরী।

১০. ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের ধারাবাহিকতা

পূর্বে বলা হয়েছে যে, প্রাক-ইসলামী যুগে মীরাস বণ্টনে ইনসাফভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ কোনো নিয়ম-নীতি ছিলো না। স্বেচ্ছাচারিতা ও 'জোর যার মুল্লুক

www.bjilibrary.com

তার' এ নীতিই সমাজে বলবৎ ছিলো। শিশু ও মহিলাদের জন্যে মীরাসে কোনো অংশ ছিলো না। শিশু ও মহিলাদের ব্যাপারে ওরা বলতো, 'ওরা উত্তরাধিকার পাবে কেন? ওরা তো ঘোড়ায় চড়তে পারে না, বোঝা বহন করতে পারে না, অন্যের উপকার করতে পারে না, শত্রুর উপর আঘাত হানতে পারে না। তাছাড়া ওদের ব্যয়ভার অন্যকে বহন করতে হয়।'[২৩]

সে সময়ে পৃথিবীর সর্বত্রই উত্তরাধিকার বন্টনের বিষয়টি ছিলো বৈষম্যপূর্ণ। ইসলাম আস্তে আস্তে এ অন্যায় প্রতিহত করে উত্তরাধিকার বন্টনের ব্যাপারে ন্যায়ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ নীতি প্রণয়ন করে। ওয়াছিয়াতের বিধানের মাধ্যমে এর ধারাবাহিকতা আরম্ভ হয়।

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ.

'তোমাদের কারো মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময় আসলে সে যদি ধন-সম্পদ রেখে যায়, তবে ন্যায়-সংগতভাবে তার পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্যে ওয়াছিয়াতের বিধান দেয়া গেল।'[২৪]

এ প্রসঙ্গে ইমাম আল বুখারী (রহ) "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم من ترك مالاً فلاهله" অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ রেখে যাবে, তার পরিবারের সদস্যরাই এর উত্তরাধিকারী হবে' এ শিরোনামে আবু হুরাইরা (রা) থেকে নিম্নের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ঃ

عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دينٌ ولم يترك وفاءً فعلينا قضائه ومن ترك مالاً فلورثته.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের জীবনের চাইতেও বেশি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং যে কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে, অথচ ঋণ পরিশোধের মত কোনো সামর্থ্য রেখে যায়নি, আমি

২৩. আত তাবারী, ফারাইয বা উত্তরাধিকার, ই.ফা.বা প্রকাশনা, পৃ. ১৩
২৪. সূরা আল বাকারা : ১৮০

www.bjilibrary.com

তার সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব নেবো। আর যদি কেউ মাল-সম্পদ রেখে মারা যায়, তবে তার ওয়ারিসগণ এর উত্তরাধিকারী হবে।'[২৫]

وعن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع الى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقالت يارسول اللّه هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل ابوهما معك يوم احدٍ شهيدًا وان عمهما اخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً ولا تُنكحان الا ولهما مالٌ قال يقضى اللّه فى ذلك فنزلت اَية الميراث فبعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الى عمهما فقال اعط لابنتى سعد الثلثين واعط امهما الثمن وما بقى فهو لَكَ.

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে : 'একদা সা'দ ইবনুর রবীর (রা) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সা'দ ইবনুর রবীর (রা) এ দুটো মেয়ে। তিনি উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে অংশ নিয়েছিলেন। এ যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ওদের চাচা তাঁর (সা'দের) সমুদয় সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। এদের জন্যে কিছুই রাখেনি। এ অবস্থায় তাদের বিয়ে-শাদী সম্ভবপর নয়।' (জবাবে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, 'এ বিষয়ে আল্লাহ ফায়সালা দেবেন।' অতপর এ প্রসঙ্গে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে মেয়ে দুটোর চাচাকে নির্দেশ দিলেন, 'তুমি সা'দের দু মেয়েকে তার সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ দুই তৃতীয়াংশ, এদের আম্মাকে (অর্থাৎ সা'দের স্ত্রীকে) $\frac{১}{৮}$ আট ভাগের এক ভাগ দিয়ে দাও এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর।'[২৬]

ইসলামের উত্তরাধিকার আইনে আত্মীয়তার সম্পর্কের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়ই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মীরাস পাবে।

২৫. সহীহ্ আল বুখারী : পৃ. ৯৯৬-৯৯৭

২৬. মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী, সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনু মাজাহ, এর বরাতে মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃ, ২৬৪

www.bjilibrary.com

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُوْنَ.

'পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। তা অল্প হোক কিংবা বেশি; এক নির্ধারিত অংশ।'[২৭]

উক্ত আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে যেমনিভাবে পুরুষদের হক আছে, তেমনিভাবে নারী ও শিশুদেরও হক আছে। এ পর্যায়ে এসে ওয়ারিসদের জন্যে ওয়াছিয়াত সংক্রান্ত পূর্বেকার বিধানটি রহিত হয়ে যায়। এখন আর ওয়ারিসদের জন্য ওয়াছিয়াত করা যাবে না। শুধু তাদের জন্যই ওয়াছিয়াতের বিধান বহাল থাকবে, যারা আসাবাহ অথবা যাবিল ফুরূয এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে আবু উমামাহ (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে : তিনি বলেন, 'আমি বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি যে,

اِنَّ اللّٰهَ اَعطى كُل ذى حق حقه فلا وصية لوارث.

'আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন, সুতরাং ওয়ারিসের জন্যে এখন আর কোনো ওয়াছিয়াত নেই।'[২৮]

১১. আল কুরআনে মীরাস বণ্টন

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ط وَلاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَه وَلَدٌ ج فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ج فَاِنْ كَانَ لَه اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ م بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَا

২৭. সূরা আন নিসা : ৭

২৮. সুনান আবু দাউদ, সুনান ইবনু মাজাহ, এর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ২৬৫

www.bjilibrary.com

اَوْ دَيْنٍ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ط
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ج فَاِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ م بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَاۤ
اَوْ دَيْنٍ ط وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ج فَاِنْ
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ م بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ
بِهَاۤ اَوْ دَيْنٍ ط وَاِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّلَه اَخٌ اَوْ
اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ج فَاِنْ كَانُوْا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ م بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْدَيْنٍ لا
غَيْرَ مُضَارٍّ ج وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ. تِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. وَمَنْ يَّعْصِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَه
عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

‘আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দু’কন্যার অংশের সমান। কিন্তু কন্যা দুই এর অধিক হলে, সে ক্ষেত্রে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির ২/৩ বা দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। আর একটি মাত্র কন্যা থাকলে, সে পাবে ১/২ বা অর্ধেক। তার (মৃত ব্যক্তির) সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে ১/৬ বা ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে। আর যদি সন্তানাদি না থাকে এবং এ অবস্থায় পিতা-মাতাই উত্তরাধিকারী হয়, তবে মা ১/৩ বা এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর তার ভাই-বোন থাকলে মা পাবে ১/৬ বা এক-ষষ্ঠাংশ। উক্ত বণ্টন কার্যকর হবে মৃত ব্যক্তির ওয়াছিয়াত পূরণ করার পর

www.bjilibrary.com

এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা ও সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের অধিক নিকটতর তা তোমরা জান না। এটা আল্লাহ্‌র বিধান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। আর তোমাদের স্ত্রীগণের রেখে যাওয়া সম্পত্তির ১/২ বা অর্ধেক তোমরা পাবে। যদি তারা কোন সন্তান রেখে না যায়। তাদের সন্তান থাকলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৪ বা এক-চতুর্থাংশ তোমরা পাবে। ওয়াছিয়াত পূরণ এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তারাও তোমাদের সম্পত্তির ১/৪ বা এক-চতুর্থাংশ পাবে। যদি তোমাদের সন্তানাদি না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তানাদি থাকে, তবে তারা পাবে ১/৮ বা এক-অষ্টমাংশ। তোমাদের ওয়াছিয়াত পূরণ করার পর এবং ঋণ পরিশোধ করার পর। যে পুরুষ অথবা নারীর মীরাস বণ্টন করা হবে, সে যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন হয়, এ অবস্থায় তার এক ভাই অথবা এক বোন থাকে, তবে উভয়ের প্রত্যেকে ১/৬ বা এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর তারা একের অধিক হলে ১/৩ বা এক তৃতীয়াংশের মধ্যে সমানভাবে অংশীদার হবে। ওয়াছিয়াত পূরণ ও ঋণ পরিশোধ করার পর, কারো কোন রকম ক্ষতি ছাড়া। এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ সহনশীল। এসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ্ এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশ থেকে ঝর্ণাধারা প্রবহমান থাকবে এবং এ বাগিচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর এটি হচ্ছে বিরাট সাফল্য। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করবে, তাকে আল্লাহ্ আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে চিরকাল অবস্থান করবে। এটি তার জন্যে অপমানজনক শাস্তি বিশেষ।'[২৯]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা মীরাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিধান ঘোষণা করেছেন। এটি চিরস্থায়ী বিধান। এ বিধানে কোন হকদারকে বঞ্চিত করা হয়নি। কারোর প্রতি কোন প্রকার অন্যায়-অবিচার করা হয়নি।

এ কারণে বিধান দেয়ার সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ তাদের জন্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, যারা নির্দ্বিধায় এ বিধান মেনে নেবে। পক্ষান্তরে যারা এ বিধান মানবে না তাদের জন্যে কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন।

এটি একটি বড় ভীতিপ্রদ আয়াত। আল্লাহ্‌র নির্ধারিত মীরাসী আইনকে যারা

২৯. সূরা আন নিসা : ১১-১৪

www.bjilibrary.com

পরিবর্তন করে কিংবা আল্লাহ্‌র কিতাবে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত অন্যান্য আইনের সীমা যারা লঙ্ঘন করে এ আয়াতে তাদের জন্যে চিরন্তন কঠিন আযাবের হুমকি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতো কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করার পরও মুসলিমগণ একেবারে ইয়াহুদীদের ন্যায় পূর্ণ ধৃষ্টতা সহকারে আল্লাহ্‌র আইনকে পরিবর্তন করেছে এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘন করেছে। মীরাসী আইনের ব্যাপারে যেসব না-ফরমানী করা হয়েছে, তা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করার শামিল। কোথাও স্ত্রীলোকদেরকে মীরাস থেকে চিরতরে বঞ্চিত করা হয়েছে। কোথাও কেবল জ্যেষ্ঠপুত্রকে সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী মনে করা হয়েছে। কোথাও মীরাসের নীতিকে গোড়া থেকে বাতিল করা হয়েছে এবং এজমালী পারিবারিক সম্পত্তি নীতি (Joint Family system) গ্রহণ করা হয়েছে। কোথাও নারী-পুরুষের অংশ সমান করে দেয়া হয়েছে। আর এখন পূর্বেকার সকল বিদ্রোহের সংগে নতুনভাবে আল্লাহ্‌দ্রোহিতা শুরু করা হয়েছে যে, কোনো কোনো মুসলিম রাষ্ট্র পাশ্চাত্যবাদীদের অনুকরণে 'মৃত্যুকর' (Death Duty) ধার্য করেছে। এর অর্থ এই যে, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সরকারও শরীক আছে, যার জন্যে আল্লাহ তা'আলা কোনো অংশ নির্ধারণ করতে ভুল করেছিলেন (معاذ الله)। অথচ ইসলামী আইনানুযায়ী সরকার তখনই কেবল উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে, যখন মৃত ব্যক্তির নিকটতর অথবা দূরবর্তী কোনো ওয়ারিস থাকবে না। তখন মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত যাবতীয় সম্পত্তি (Unclaimed Properties-এর ন্যায়) সরকারী ফাণ্ডে জমা করা হবে। অথবা মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে যদি সরকারের জন্যে কোনো ওয়াছিয়াত করে যায়, তবে ওয়াছিয়াত অনুযায়ী সরকার অংশ পাবে, অন্যথায় নয়।'[৩০]

১২. ইসলামের মীরাস বণ্টন পদ্ধতি চিরস্থায়ী

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মীরাস বণ্টনের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ বিধান নাযিল করেছেন। তিনি এ ব্যাপারে কোনরূপ নতুন চিন্তাভাবনা কিংবা সংস্কার ও পরিমার্জনের অবকাশ রাখেননি। এ মজবুত ও নিখুঁত বিধানে কোন হকদারকে বঞ্চিত করা হয়নি। কারো পক্ষ থেকে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব ও যুল্‌মের অভিযোগ তোলার সুযোগ রাখা হয়নি। প্রত্যেকের অংশ মহান আল্লাহ ন্যায় ও সুবিচারের দাঁড়িপাল্লায় পরিমাপ করে দিয়েছেন।

---

৩০. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ), তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নিসার ২৬ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সকল সম্পত্তিই মীরাসের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তি সাধারণত দু'ধরনের সম্পত্তি রেখে যায়। (১) তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র। যেমন, পোশাক-আশাক, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অলংকারাদি। (২) বিষয়-সম্পত্তি। যেমন, জমি-জমা, টাকা-পয়সা ও ব্যবসায়ের মালামাল। মুরিসের মৃত্যুর পর তার জীবিত ওয়ারিসগণই কেবলমাত্র মীরাস পাবার অধিকারী হবে।

১৩. মীরাস বণ্টনের পূর্বে করণীয়

মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি তার জীবিত ওয়ারিসগণের মধ্যে বণ্টনের পূর্বে নিম্নোক্ত ৩টি কাজ (প্রয়োজনে তার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে) আগে সমাধা করতে হবে।

(১) মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা।

তার রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ দ্বারা সর্বপ্রথম ন্যায়সংগতভাবে তার গোছল ও কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে যাতে কোন প্রকার অপব্যয় বা ত্রুটি না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

(২) মৃত ব্যক্তির ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করা।

কাফন-দাফনের পর তার অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট থাকলে দেখতে হবে তার কোন অপরিশোধিত ঋণ আছে কিনা। যদি ঋণ থাকে, তবে তা তখনই পরিশোধ করতে হবে। আল কুরআনে বলা হয়েছে :

"من بعد وصية يوصى بها او دين"

অর্থাৎ, (মৃত ব্যক্তির) ওয়াছিয়াত ও ঋণ পরিশোধ করার পর ওয়ারিসগণের মধ্যে ত্যাজ্য সম্পত্তি বণ্টন করা হবে। মুসনাদে আহমাদে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে :

"نفس المؤمن معلقة بدَينه حتى يُقضى عنه"

"মুমিনের আত্মা তার ঋণের সংগে ঝুলন্ত থাকে, যে পর্যন্ত তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করা না হবে।"

(৩) মৃত ব্যক্তির وصية (ওয়াছিয়াত) পূরণ করা।

উপরোক্ত ২টি কাজ সমাধা করার পর ত্যাজ্য সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকলে এর এক-তৃতীয়াংশ দিয়ে মৃত ব্যক্তির ওয়াছিয়াত পূরণ করতে হবে। ওয়াছিয়াত পূরণ করার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তি প্রযোজ্য নয়। কারণ এতে জীবিত ওয়ারিসগণ সম্পত্তি কম পাওয়ার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কারণে মানবতার

www.bjilibrary.com

বিশ্বস্ত বন্ধু নবী মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বাণীতে এ ঘোষণা দিয়েছেন।

উপরোক্ত ৩টি কার্য সমাধা করার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তবে ৪র্থ পর্যায়ে এসে তা কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'ই উম্মাত এর আলোকে জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টিত হবে।

১৪. ওয়ারিস পরিচিতি

ওয়ারিস মূলত ৩ প্রকার। (১) ذوى الفروض (যাবিল ফুরূয), (২) عصبة (আসাবাহ্), (৩) ذوى الارحام (যাবিল আরহাম)।

আল্-কুরআনে ৬টি অংশ বর্ণিত হয়েছে। আর তা হচ্ছে : অর্ধেক (১/২), এক-চতুর্থাংশ (১/৪), এক-অষ্টমাংশ (১/৮), দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩), এক তৃতীয়াংশ (১/৩), এবং এক ষষ্ঠাংশ (১/৬), এবং উক্ত হিস্সাগুলোর অংশীদার হিসেবে ১২ জনের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

এদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ। তারা হলো : (১) পিতা, (২) দাদা অর্থাৎ বাপের পিতা, দাদার পিতা- এভাবে ঊর্ধ্বতন পুরুষ দাদার মধ্যে শামিল, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই (মা এর পেটের ভাই), (৪) স্বামী।

এদের মধ্যে ৮জন নারী। তারা হলো : (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পুত্রের কন্যা, (৪) সহোদরা বোন, (৫) বৈমাত্রেয় বোন, (৬) বৈপিত্রেয় বোন, (৭) মাতা ও (৮) দাদী-নানী (দাদীর মাতা, নানীর মাতা– এ ধারার ঊর্ধ্বক্রমের সকলে)।

উক্ত ৪ জন পুরুষ ওয়ারিসের মধ্যে ২জন কখনো সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয় না। তারা হলো : পিতা ও স্বামী। আর অপর ২জন অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো বঞ্চিত হয়। যেমন : পিতামহ, প্রপিতামহ ও তদূর্ধ্ব পুরুষগণ পিতার বর্তমানে বঞ্চিত হয়।

অনুরূপভাবে ৮জন মহিলা ওয়ারিসের মধ্যে মাতা, স্ত্রী ও কন্যা এ ৩জন কোন অবস্থায়ই মীরাস থেকে বঞ্চিত হয় না। অন্যরা অবস্থার প্রেক্ষিতে বঞ্চিত হতে পারে, যা পরে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।

উপরোক্ত ওয়ারিসদেরকে যাবিল ফুরূয (ذوى الفروض) বলা হয়। ذوى الفروض। এর বর্তমানে তাদের অংশ দেয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির মালিক হবে 'আসাবা (عصبة) শ্রেণীর ওয়ারিসগণ। যাবিল ফুরূযের অবর্তমানে 'আসাবাগণ

www.bjilibrary.com

সমুদয় সম্পত্তির মালিক হয়ে যায়। ওয়ারিসদের মধ্যে দূরতম আরো একটি শ্রেণী আছে, যাকে যাবিল আরহাম ذوى الارحام বলা হয়। একটু পরে এসব ব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা আসবে।

১৫. গর্ভস্থ ও নবজাত সন্তানের উত্তরাধিকার

কেউ যদি তার সন্তান সম্ভবা আত্মীয়া রেখে মারা যায়, তবে তার সম্পত্তি বণ্টনের ব্যাপারে তড়িঘড়ি করা যাবে না। কারণ, গর্ভস্থ সন্তান নিজেও ওয়ারিস হতে পারে অথবা অন্যকে ওয়ারিস বানাতে পারে। অর্থাৎ তার সম্পত্তিতে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং সেও অন্যের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হতে পারে। আবার অবস্থা ভেদে বঞ্চিতও হতে পারে।

গর্ভস্থ সন্তান যদি মৃত ব্যক্তির হয় অর্থাৎ কোন স্বামী যদি গর্ভবতী স্ত্রী রেখে মারা যায়, তবে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা পর্যন্ত মীরাস বণ্টন স্থগিত রাখতে হবে। হানাফী মাযহাবে গর্ভধারণের সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে দু'বছর। এ হিসেবে স্বামী মারা যাওয়ার পর দু'বছর পূর্ণ হওয়ার আগে যদি তার স্ত্রী সন্তান প্রসব করে, তবে সে সন্তান তারই সন্তান হিসেবে গণ্য হবে এবং এ সন্তান তার পিতার উত্তরাধিকারী হবে। ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা এসেছে। এখানে সংক্ষিপ্ত করা হলো।[৩১]

কোন সন্তান জীবিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে যদি পরক্ষণে মৃত্যু বরণ করে, তবে সে উত্তরাধিকারী হবে।

عن جابر (رض) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اِسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّىَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ.

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'নবজাত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় চিৎকার দিলে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হওয়া প্রমাণিত হলে, তার জন্য ছালাতুল জানাযা আদায় করতে হবে এবং মীরাস থেকে তার প্রাপ্য অংশ দিতে হবে।'[৩২]

কিন্তু সন্তান যদি মৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, তবে ওয়ারিস হবে না। যদি প্রসবকালে মারা যায়, তবে দেখতে হবে কতটুকু বের হওয়ার পর মারা গেছে।

---

৩১. বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন : শামী, আলমগীরী, লতিফী।

৩২. সুনান ইবনু মাজাহ্, আদ্ দারিমী, এর বরাতে মিশকাতুল মাছাবীহ, ২৬৩ পৃ.।

www.bjilibrary.com

যদি সোজাসুজি বের হয়, তবে বুক পর্যন্ত বের হওয়ার পর মারা গেলে ওয়ারিস হবে, অন্যথায় হবে না। (বিস্তারিত জানার জন্য ফিক্হর কিতাবসমূহ দ্রষ্টব্য)।

ওয়ারিস যেই হোক না কেন– পুরুষ, নারী, নবজাত সন্তান, গর্ভস্থ সন্তান (ভূমিষ্ঠ হবার পর) নির্বিশেষে সকলকে তাদের প্রাপ্য অংশ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ প্রদান করেছেন।

عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأَوْلى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'ওয়ারিসদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ দিয়ে দাও। এরপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী পুরুষ 'আসাবাহ্কে দিয়ে দাও।'[৩৩]

১৬. পিতার অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

পিতার মোট তিন অবস্থা হতে পারে।

(১) মৃত ব্যক্তির পিতা শুধুমাত্র যাবিল ফুরূয হিসেবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ পাবেন, যদি মৃত ব্যক্তি পুত্র সন্তান (পুত্রের পুত্র বা নাতি এভাবে নিচের দিকে যাকেই) রেখে যায়।

(২) মৃত ব্যক্তির পিতা একই সাথে যাবিল ফুরূয হিসেবে অংশ পাবে এবং আসাবাহ্ হিসেবেও, যদি মৃত ব্যক্তি কন্যা বা কন্যার কন্যা (নাতনী) এভাবে নিচের দিকের কাউকে রেখে যায়।

(৩) পিতা কেবল 'আসাবাহ্ হিসেবে মীরাস পাবে, যদি মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান-সন্ততি রেখে না যায়।

১ম অবস্থার দৃষ্টান্ত

	মাসআলা–৬	
মৃত (যায়িদ)	পিতা (জীবিত)	পুত্র/পুত্রের পুত্র (জীবিত)
	১	৫

৩৩. সহীহ আল বুখারী-৯৯৭

www.bjilibrary.com

২য় অবস্থার দৃষ্টান্ত

	মাসআলা–৬	
মৃত (যায়িদ)	পিতা	কন্যা/কন্যার কন্যা
	১+২=৩	৩

৩য় অবস্থার দৃষ্টান্ত

	মাসআলা–৩	
মৃত (যায়িদ)	পিতা	মাতা
	২	১

মনে করি যায়েদ মৃত্যুকালে তার পিতা খালেদ ও পুত্র আকরামকে রেখে যায়। মৃত্যুর পর ইসলামী শরী'আহ্ অনুযায়ী তার কাফন, দাফন, ঋণ পরিশোধ ও ওয়াছিয়াত পূরণ করার পর মীরাস বণ্টনের পালা আসে। তার সম্পত্তির পরিমাণ ১০,০০০/= (দশ হাজার) টাকা।

পিতা খালেদ এর প্রাপ্যাংশ ১০,০০০/= টাকার $\frac{১}{৬}$ = ১,৬৬৬.৬৭

পুত্র আকরাম অবশিষ্ট সব টাকার মালিক, যার পরিমাণ = ৮,৩৩৩.৩৩

মোট- ১০,০০০.০০ টাকা

এখানে ذوى الفروض হিসেবে পিতাকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দেয়ার পর 'আসাবা হিসেবে পুত্র বাদ বাকী সব টাকা পেয়ে যায়।

এ নিয়ম অনুসরণ করে সহজেই ফারাইয করা যেতে পারে।

১৭. দাদার অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে দাদা কোন অংশ পায় না। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক থেকে দাদা অপেক্ষা পিতা নিকটতম। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইসলামী উত্তরাধিকার নীতির ভিত্তি হচ্ছে নিকটাত্মীয়তা। সুতরাং নিকটতম আত্মীয়ের বর্তমানে দূরতম আত্মীয় মীরাস পায় না।

পিতার অবর্তমানে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়ে মীরাস পাবে। আর এ ক্ষেত্রে পিতার অবস্থা ও অংশ দাদার ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে। অবশ্য চারটি ক্ষেত্রে পিতা ও দাদার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ফারাইয গ্রন্থ "সিরাজী"।

www.bjilibrary.com

১৮. বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বলতে তাদেরকে বুঝায়, যারা মৃত ব্যক্তির মায়ের গর্ভজাত হলেও তার পিতার ঔরসজাত সন্তান নয়। বরং মায়ের অন্য কোন স্বামীর ঔরসে তাদের জন্ম। এ ধরনের ভাই-বোন কখনো 'আছাবাহ হয় না। শুধুমাত্র যাবিল ফুরূয হিসেবেই মীরাসের অধিকারী হয়। তার তিন অবস্থা হতে পারে।

(১) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ১ জন থাকলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির $\frac{১}{৬}$ পাবে, যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা অথবা তাদের সন্তান, পিতা অথবা পিতামহ এদের কেউ জীবিত না থাকে।

(২) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন ২ জন অথবা ততোধিক থাকলে $\frac{১}{৩}$ পাবে, যদি ১ম অবস্থায় বর্ণিত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের কেউ জীবিত না থাকে।

উল্লেখ্য যে বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সমান সমান অংশ পাবে।

(৩) মৃত ব্যক্তির ছেলে, মেয়ে অথবা তাদের সন্তানাদি, অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির পিতা অথবা দাদা– এদের কেউ জীবিত থাকলে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন বঞ্চিত হবে।

১৯. স্বামীর অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

স্ত্রী তার স্বামী রেখে মারা গেলে ذوى الفـروض হিসেবে স্বামী তার স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মীরাস পাবে। এ ক্ষেত্রে স্বামীর দু'অবস্থা হতে পারে :

(১) মৃত্যুকালে স্ত্রী তার গর্ভজাত কোন সন্তান-সন্ততি (পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী– তা যত নিচের দিকে যাক) রেখে না গেলে স্বামী ষোল আনা সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

যেমন :

মাসআলা-২

মৃত (যায়িদ)	পিতা (জীবিত)	স্বামী (জীবিত)
	১	১

(২) মৃত্যুকালে স্ত্রী যদি ১ম অবস্থায় বর্ণিত আত্মীয়দের কাউকে রেখে যায় তবে স্বামী $\frac{১}{৪}$ পাবে।

যেমন :

মাসআলা–৪

মৃত (যায়িদ)	ছেলে (জীবিত)	স্বামী (জীবিত)
	৩	১

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য যে, স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান বলতে তার বর্তমান স্বামীর ঔরসজাত, প্রাক্তন স্বামীর ঔরসজাত অথবা আলাদাভাবে উভয় স্বামীর ঔরসজাত– এ সব রকমের সন্তান-সন্ততিকেই বুঝানো হয়েছে। মোদ্দাকথা, তার গর্ভজাত সন্তান, সন্তানের সন্তান, তস্য সন্তান– এভাবে যত নিচেরই হোক, কেউ জীবিত থাকলে স্বামীর অংশ $\frac{1}{2}$ থেকে হ্রাস পেয়ে $\frac{1}{4}$ হয়ে যাবে।

এ পর্যন্ত ذوى الفروض এর সর্বমোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৪ জন পুরুষের অবস্থা ও অংশ বর্ণিত হলো। নিম্নে ৮ জন নারীর অবস্থা ও অংশ সংক্ষেপে বর্ণনা করা যাচ্ছে।

২০. স্ত্রীর অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

স্বামী যদি তার স্ত্রী রেখে মৃত্যু বরণ করে, তবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর মীরাস সর্বাবস্থায় সংরক্ষিত থাকবে। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীরও মীরাস লাভের দুই অবস্থা :

(১) স্বামী তার মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া স্ত্রীর সংগে তারই গর্ভজাত অথবা তার অন্য কোন স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি (পুত্র, কন্যা, নাতি, নাতনী অথবা তাদের আওলাদ) রেখে না গেলে তার স্ত্রী (একজন হোক অথবা একাধিক) পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{1}{4}$ অংশ পাবে।

যেমন :

মৃত (যায়িদ)	মাসআলা–৪	
	চাচা (জীবিত)	স্ত্রী (জীবিত)
	৩	১

(২) মৃত্যুকালে স্বামী ১ম অবস্থায় বর্ণিত আত্মীয়দের কাউকে রেখে গেলে স্ত্রী $\frac{1}{8}$ অংশ পাবে।

যেমন :

মৃত (যায়িদ)	মাসআলা–৮	
	স্ত্রী	ছেলে
	১	৭

২১. কন্যার অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

কন্যাও সর্বাবস্থায় মীরাস পাবে। তার মোট ৩ অবস্থা হতে পারে। দুই অবস্থায় সে ذوى الفروض হিসেবে এবং এক অবস্থায় عصبة হিসেবে মীরাস পাবে।

(১) কন্যা যদি ১ জন হয় এবং সে সংগে মৃত ব্যক্তির যদি কোন ছেলে না থাকে, তবে কন্যা তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{1}{2}$ অংশ পাবে।

www.bjilibrary.com

যেমন : মাসআলা–২

মৃত (যায়িদ)	কন্যা	চাচা
	১	১

(২) কন্যা যদি ২ জন অথবা ততোধিক হয় এবং সে সাথে মৃত ব্যক্তির ছেলে না থাকে তবে কন্যাগণ $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে এবং তাদের মাথা পিছু সমানভাবে বণ্টিত হবে।

যেমন : মাসআলা–৩

মৃত (যায়িদ)	কন্যা ২/৩ জন	চাচা
	২	১

(৩) কন্যার সংগে যদি মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কন্যা ذوى الفروض। থাকে না। তখন মীরাস পাবে عصبة হিসেবে। কারণ তার ভাই তাকে عصبة বানিয়ে ফেলবে। একে عصبة بغيره বলা হয়। তখন আল কুরআনের ঘোষণা :

"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"

"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান" মুতাবিক পুরুষ স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ এ নীতিতে পুত্র-কন্যার মধ্যে মীরাস বণ্টন করা হবে।

যেমন : মাসআলা–৩

মৃত (যায়িদ)	ছেলে	মেয়ে
	২	১

উল্লেখ্য যে, ছেলের অংশ মেয়ের অংশের দ্বিগুণ কেন? এ ব্যাপারে ইন্‌শাআল্লাহ্ এই প্রবন্ধে বাদ বাকি ওয়ারিসদের অবস্থা ও অংশ বর্ণনার পর আলোকপাত করা হবে।

২২. পৌত্রীর (ছেলের কন্যা) অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

এখানে পৌত্রী বলতে পুত্রের কন্যা, পৌত্রের কন্যা, প্রপৌত্রের কন্যা– এভাবে যত নিচের হোক অধঃস্তন পুত্রের কন্যাকে বুঝানো হয়েছে। তারা– যথাক্রমে একের অবর্তমানে অপরজন পৌত্রী হিসেবে মীরাস পাবে। পৌত্রী মৃত দাদার সম্পত্তিতে

www.bjilibrary.com

কখনো ذوى الفروض হিসেবে এবং কখনো عصبة হিসেবে অংশ পায়। আবার অবস্থা ভেদে কখনো বঞ্চিতও হয়। তার মীরাস পাবার জন্যে শর্ত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির কোন পুত্র সন্তান বা দুই কন্যা জীবিত না থাকা।

দাদার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মীরাস প্রাপ্তির ব্যাপারে পৌত্রীর মোট ৬ অবস্থা হতে পারে। ৩ অবস্থায় সে ذوى الفروض হিসেবে মীরাস পাবে। ২ অবস্থায় পাবে عصبة بغيره হিসেবে। এক অবস্থায় বঞ্চিত হবে।

(১) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা কেউ না থাকে, কেবল একজন পৌত্রী থাকে, তখন পৌত্রীর অংশ হবে সম্পত্তির $\frac{১}{২}$।

(২) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা না থাকে এবং এ অবস্থায় ২ বা ততোধিক পৌত্রী থাকে, তখন তারা সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে।

(৩) মৃত ব্যক্তির যদি পুত্র-কন্যা কেউ না থাকে এবং এ অবস্থায় পৌত্র থাকে আর সে সংগে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে, তখন পৌত্রের কারণে পৌত্রী عصبة হয়ে যাবে। এ অবস্থায় অন্যান্য ذوى الفروض এর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তিতে পৌত্র-পৌত্রী "للذكر مثل حظ الانثيين" (পুরুষ নারীর দ্বিগুণ) এ নিয়মে অংশ পাবে।

(৪) মৃত ব্যক্তির যদি একজন কন্যা থাকে (পুত্র/প্রপৌত্র না থাকে) এবং তার সাথে এক বা একাধিক পৌত্রী থাকে, তবে পৌত্রীর অংশ হবে $\frac{১}{৬}$। একজন হলে একাই $\frac{১}{৬}$ অংশ পুরোটা পাবে, আর একাধিক হলে সবাই মিলে $\frac{১}{৬}$ অংশ ভাগ করে নেবে।

উল্লেখ্য যে, মীরাস প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে দুই-তৃতীয়াংশ। $\frac{২}{৩}$ এর বেশি তারা কখনো পাবে না। সুতরাং উক্ত অবস্থায় কন্যা $\frac{১}{২}$ পাবার পর মেয়েদের সর্বোচ্চ মীরাস $\frac{২}{৩}$ অংশ পূরণ করার জন্য পৌত্রীকে $\frac{১}{৬}$ অংশ দিয়ে সেটা পূরণ করা হয়েছে।

(৫) মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক কন্যা সন্তান থাকে, তবে পৌত্রী বঞ্চিত হবে। কারণ ২ বা ততোধিক কন্যা সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ পেয়ে গেলে মেয়েদের জন্য এর বেশি পাওয়ার আর সুযোগ থাকে না। তবে এ অবস্থায় পৌত্রীর সঙ্গে তার সমস্তরের অথবা নিচের স্তরের কোন পৌত্র যদি থাকে, তবে সে পৌত্রের কারণে পৌত্রী عصبة হিসেবে মীরাস পাবে।

www.bjilibrary.com

(৬) মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান থাকলে পৌত্রী বঞ্চিত হবে। কারণ নিকটতম আত্মীয় থাকা অবস্থায় দূরের আত্মীয় বঞ্চিত হয়।

২৩. আপন বোনের অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে তার আপন বোন মীরাস পাবে। সে মীরাস পাবে কখনো ذوى الفروض হিসেবে, কখনো عصبة হিসেবে, আবার অবস্থা ভেদে বঞ্চিতও হতে পারে। তার মীরাসপ্রাপ্তির জন্য শর্ত হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র (যত নিচের হোক), পিতা অথবা দাদা জীবিত না থাকা। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে এসেছে :

يَسْتَفْتُوْنَكَ ط قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ط اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ وَّلَه اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ج

"তারা আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়– আপনি বলে দিন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে "কালালাহ্"-এর মীরাস সংক্রান্ত ফতোয়া দিচ্ছেন যে, যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে অথচ বোন থাকে, তবে সে পাবে তার সম্পত্তির অর্ধেক।"[৩৪]

উক্ত আয়াতে বোনের মীরাস প্রাপ্তির জন্য যেমন মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকার শর্তারোপ করা হয়েছে, তেমনি "كلالة" (কালালাহ্) শব্দ দ্বারা এটাও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, বোনের মীরাস পাবার জন্য মৃত ব্যক্তির পিতা বা দাদা বর্তমান না থাকাও শর্ত। কেননা আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বোন "কালালাহ্" জাতীয় মৃতেরই মীরাস লাভ করে। আর "কালালাহ্" বলা হয় এমন মৃত ব্যক্তিকে যার পুত্র, পৌত্র, পিতা, দাদা কেউ নেই।[৩৫]

মীরাস প্রাপ্তির ব্যাপারে বোনের মোট ৫ অবস্থা হতে পারে।

(১) বোন যদি একজন থাকে, তবে সে মৃত ভাইর পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে।

যেমন : মাসআলা–২

মৃত (যায়িদ)	আপন বোন ১ জন	চাচা
	১	১

৩৪. সূরা আন নিসা : ১৭৬

৩৫. আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, তাফসীরে রুহুল মা'আনী।

www.bjilibrary.com

(২) বোন যদি দুই বা ততোধিক থাকে তবে ২/৩ অংশ পাবে।

যেমন : মাসআলা–৩

মৃত (যায়িদ)	আপন বোন ২/৩ জন	চাচা
	২	১

(৩) বোনের সাথে যদি ভাই জীবিত থাকে, তবে ভাইয়ের কারণে বোন عصبة হয়ে যাবে এবং পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসেবে মীরাস পাবে।

যেমন : মাসআলা–৩

মৃত (যায়িদ)	আপন ভাই	আপন বোন
	২	১

(৪) মৃত ব্যক্তির কন্যা অথবা পৌত্রীর সাথে আপন বোন عصبة হয়ে যাবে এবং ذوى الفروض এর অংশ প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি বোন পেয়ে যাবে।

যেমন : মাছআলা–৬

মৃত (যায়িদ)	কন্যা	পৌত্রী	বোন
	৩	১	২

মু'আয (রা) মৃত ব্যক্তির এক কন্যাকে সম্পত্তির ১/২ অংশ প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ১/২ অংশ মৃত ব্যক্তির বোনকে প্রদান করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন তাঁদের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।[৩৬]

এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) মৃতের কন্যাকে ১/২ ও পৌত্রীকে ১/৬ এবং অবশিষ্ট অংশ মৃতের বোনকে প্রদান করেন এবং একে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ফায়সালার অনুরূপ বলে দাবী করেন।[৩৭]

(৫) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র (যত নিচের হোক) অথবা পিতা, দাদা জীবিত থাকলে আপন বোন মীরাস পাবে না।

২৪. বৈমাত্রেয় বোনের অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

বৈমাত্রেয় বোন কখনো ذوى الفروض হিসেবে, কখনো عصبة হিসেবে মীরাস পায়। অবস্থা ভেদে কখনো বঞ্চিতও হয়। তার মোট ৭ অবস্থা হতে পারে।

৩৬. ইলাউস সুনান, ১৮তম খণ্ড।

৩৭. আল হাকীমের বরাতে ইলাউস সুনান, ১৮তম খণ্ড।

www.bjilibrary.com

(১) বৈমাত্রেয় বোন একজন থাকলে সে ذوى الفروض হিসেবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{১}{২}$ অংশ পাবে। (আপন বোনদের অবর্তমানে)।

(২) বৈমাত্রেয় বোন ২ জন বা ততোধিক থাকলে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির $\frac{২}{৩}$ অংশ পাবে। (আপন বোনদের অবর্তমানে)।

(৩) মৃত ব্যক্তির যদি একজন মাত্র আপন বোন থাকে এবং তার সাথে বৈমাত্রেয় বোনও থাকে, তবে এ অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে (মেয়েদের সর্বোচ্চ মীরাস $\frac{২}{৩}$ পূরণ করার জন্য)।

(৪) মৃত ব্যক্তির ২ জন আপন বোন থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন মীরাস পাবে না।

(৫) তবে হ্যাঁ, উক্ত অবস্থায় যদি মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাইও (জীবিত) থাকে, তবে এর কারণে বৈমাত্রেয় বোন عصبة হয়ে যাবে এবং ذوى الفروض হিসেবে আপন বোনদেরকে অংশ দেয়ার পর বাদ বাকী সম্পত্তি বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন "للذكر مثل حظ الانثيين" (পুরুষ নারীর দ্বিগুণ) হিসেবে পেয়ে যাবে।

(৬) মৃত ব্যক্তির যদি কন্যা বা পৌত্রী থাকে এবং সে সঙ্গে বৈমাত্রেয় বোন থাকে, তবে এ অবস্থায় বৈমাত্রেয় বোন عصبة হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট অংশ পেয়ে যাবে।

(৭) মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র (যত নিচের হোক) পিতা, পিতামহ, আপন ভাই, দুইজন আপন বোন অথবা একজন আপন বোন সেই সংগে কন্যা বা পৌত্রী জীবিত থাকলে বৈমাত্রেয় বোন মীরাস পাবে না।

২৫. বৈপিত্রেয় বোনের অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

বৈপিত্রেয় বোন বলতে সে বোনকে বুঝায় যে এবং মৃত ব্যক্তি একই মায়ের পেটের সন্তান, কিন্তু তাদের পিতা ভিন্ন। এরূপ বোনের ৩ অবস্থা হতে পারে।

(১) মৃত ব্যক্তির যদি একজন বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তবে সে $\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে।

(২) দুই অথবা ততোধিক বৈপিত্রেয় বোন থাকলে $\frac{১}{৩}$ অংশ পাবে। বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন সমান অংশ পাবে। তাদের বেলায় নারী-পুরুষের তারতম্য হয় না। সুতরাং পুরুষ নারীর দ্বিগুণ পাওয়ার নিয়ম বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

(৩) মৃত ব্যক্তির পুত্র, কন্যা অথবা পৌত্র, পৌত্রী, (যত নিচের দিকে হোক), পিতা, দাদা– এদের কারো বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মীরাস পাবে না।

www.bjilibrary.com

২৬. মায়ের অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

মৃত্যুকালে কোন ব্যক্তি মাকে রেখে গেলে মা মীরাস পাবে। মা সর্বাবস্থায় সন্তানের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভ করে এবং মা কখনো বঞ্চিত হয় না। মা'র মোট ৩ অবস্থা হতে পারে :

(১) মৃত ব্যক্তির ছেলে, মেয়ে অথবা নাতি, নাতনী (যত নিচের হোক) কেউ জীবিত থাকলে মা তার সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৬ অংশ পাবে।

যেমন :

	মাছআলা–৬		
মৃত (যায়িদ)	মা	ছেলে ১ জন	মেয়ে ৩ জন
	১	২	৩

অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির যদি দুই বা ততোধিক ভাই-বোন জীবিত থাকে; আপন ভাই-বোন অথবা বৈমাত্রেয় ভাই-বোন অথবা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন অথবা একাধিক প্রকারের মিশ্রিত ভাই-বোন যাই হোক না কেন, এ অবস্থায় মা ১/৬ অংশ পাবে।

যেমন :

	মাছআলা–৬		
মৃত (যায়িদ)	মা	আপন ভাই	বৈপিত্রেয় বোন
	১	৪	১

(২) উপরোক্ত আত্মীয়দের অবর্তমানে মা তার মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে।

যেমন :

	মাছআলা–৩	
মৃত (যায়িদ)	মা	বাপ
	১	২

(৩) দুইটি মাছআলাতে মা ذوی الفروض হিসেবে স্বামী অথবা স্ত্রী অংশপ্রাপ্তির পর অবশিষ্ট সম্পত্তির ১/৩ অংশ পাবে।

* একটি মাসআলা হলো : মৃত ব্যক্তি তার স্বামী ও পিতা-মাতা রেখে যাবে।

যেমন :

	মাছআলা–৬		
মৃত (যায়িদ)	স্বামী	পিতা	মাতা
	৩	২	১

www.bjilibrary.com

* দ্বিতীয় মাসআলাটি হলো : মৃত ব্যক্তি তার স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে যাবে।

যেমন :

	মাছআলা–১২		
মৃত (যায়িদ)	স্ত্রী	পিতা	মাতা
	৩	৬	৩

উক্ত দুইটি মাসআলায় উমার (রা) এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করায় অধিকাংশ সাহাবী তা গ্রহণ করে নেন।

কিন্তু উক্ত দুই অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পিতার স্থলে যদি দাদা জীবিত থাকে– অর্থাৎ কেউ যদি স্ত্রী, দাদা ও মা রেখে মৃত্যুবরণ করে অথবা স্বামী, দাদা ও মা রেখে মারা যায়, তবে মা সমুদয় সম্পত্তির ১/৩ পাবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর মত। কেননা পিতা জীবিত থাকলে তখন মাকে স্বামী অথবা স্ত্রীর অংশ (ذوى الفروض হিসেবে) প্রদানের পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ এজন্য দেয়া হবে যাতে মায়ের অংশের পরিমাণ পিতার অংশের পরিমাণের চেয়ে বেশি না হয়ে যায়। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) এর প্রশ্নের উত্তরে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) একথাই বলেছিলেন।

তবে পিতার স্থলে যদি দাদা থাকে, তবে দাদা যেহেতু মায়ের সম স্তরের উত্তরাধিকারী নয়, সুতরাং সেক্ষেত্রে উক্ত মূলনীতি প্রযোজ্য নয়। কাজেই দাদার সাথে মা ষোল আনা সম্পত্তির ১/৩ বা এক-তৃতীয়াংশ পাবে।

২৭. দাদী-নানীর অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্যাংশ

আরবীতে "جدة" শব্দটি দ্বারা দাদী– পিতার মা, পিতামহের মা, পিতামহীর মা, প্রপিতামহের মা, প্রপিতামহীর মা এভাবে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বুঝায়। অনুরূপভাবে "جدة" দ্বারা নানী– মায়ের মা, নানীর মা, নানীর নানী এভাবে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বুঝায়। এদের মধ্যে বাপের মা ও মায়ের মা প্রথম স্তরের দাদী-নানী। দ্বিতীয় স্তরের দাদী-নানী হচ্ছে দাদার মা, দাদীর মা ও নানীর মা। প্রথম স্তরের বর্তমানে উর্ধ্বতন স্তরের দাদী-নানী বঞ্চিত হয়। পৌত্র-পৌত্রী ও দৌহিত্র-দৌহিত্রীর সম্পত্তিতে দাদীর ও নানীর মীরাস আছে। মায়ের অবর্তমানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাদী-নানীকে মীরাস প্রদান করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উলামায়ে উম্মাহ্ও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তারা মীরাস লাভ করে ذوى الفروض হিসেবে। আবার অবস্থা ভেদে বঞ্চিতও হয়। তাদের মোট ৩ অবস্থা হতে পারে :

www.bjilibrary.com

(১) মৃত ব্যক্তির পিতা, মাতা, দাদা (যত ঊর্ধ্বের হোক) জীবিত না থাকলে দাদী ও নানী ১/৬ অংশ পাবে।

ইমাম আবূ দাঊদ, ইমাম ইবন্ মাজাহ্ (রহ) প্রমুখ উদ্ধৃত করেন যে, একবার আবু বাকর (রা) এর নিকট এক "جدة" নানী মীরাসের দাবী নিয়ে আসলে তিনি বলেন, আল্লাহর কিতাবে আপনার কোন অংশ নেই। আল্লাহ্র রাসূলের নিকট থেকেও এ মর্মে আমি কিছু জানতে পারিনি। কাজেই আপনি চলে যান। আমি এ ব্যাপারে পরামর্শ করবো। তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলে মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বললেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট এক "جدة" নানী উপস্থিত হলে তিনি তাকে ১/৬ অংশ দিয়েছিলেন। আবু বাকর (রা) এ বিষয়ে সাক্ষী চাইলেন। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ (রা) মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) এর সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করলেন। তখন আবু বাকর (রা) ঐ "جدة" কে ১/৬ অংশ প্রদান করলেন। অতঃপর মৃত ব্যক্তির দাদী এসে উমার (রা)-এর নিকট মীরাস দাবী করলো। হযরত উমার (রা) বললেন, আমার মতে ঐ ১/৬ অংশে আপনারা দু'জন শরীক হবেন। ই'লাউস সুনানের এক বর্ণনায়ও এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পিতার দিক থেকে দুই "جدة" (পিতার মায়ের মা) এবং (পিতার পিতার মা) এবং মায়ের দিক থেকে এক "جدة" (মায়ের মায়ের মা)-কে সম্মিলিতভাবে ১/৬ অংশ প্রদান করেছেন।[৩৮]

যদি এক দাদী এক সূত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হয়, যেমন মৃতের পিতার নানী, আর অপর দাদী দুই বা তার বেশি সূত্রে আত্মীয় হয়, যেমন একই মহিলা মাতার নানী এবং পিতার দাদী– এ অবস্থায় ইমাম আবূ ইউসুফের (রহ) মতে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ১/৬ অংশ উভয় দাদীর মধ্যে মাথাপিছু হারে বণ্টন করা হবে।

(২) মৃত ব্যক্তির পিতা জীবিত থাকলে দাদী বঞ্চিত হবে। অবশ্য নানীর অংশ ১/৬ বহাল থাকবে। কারণ দাদীর মীরাস যেহেতু পিতার মধ্যস্থতায় হয়, আর নিয়মানুযায়ী মধ্যস্থতাকারীর বর্তমানে মধ্যস্থতা লাভকারী বঞ্চিত হয়, তাই পিতার বর্তমানে দাদী বঞ্চিত হবে। দাদার দ্বারা ঊর্ধ্বতন দাদাগণ বঞ্চিত হয়, তবে মৃত ব্যক্তির দাদী বা পিতার মা (যথা দাদার স্ত্রী) দাদা দ্বারা বঞ্চিত হবে না। কারণ তার মধ্যস্থতাকারী মৃত ব্যক্তির দাদা নয়– বরং পিতা; সুতরাং দাদা জীবিত থাকা অবস্থায়ও দাদী মীরাস লাভ করবে।

৩৮. ইলাউস সুনানের বরাতে ই.ফা.বা কর্তৃক অনূদিত ফারাইয ও উত্তরাধিকার, পৃ. ৪১

www.bjilibrary.com

(৩) মৃত ব্যক্তির মা জীবিত থাকলে দাদী ও নানী কোন অংশ পাবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাদী-নানীকে মীরাস প্রদান করেছেন মা না থাকা অবস্থায়।[৩৯] সুতরাং মা'র বর্তমানে তারা মীরাস পাবে না।

২৮. 'عصبة' ('আছাবাহ্) এর বিবরণ

উপরে ذوى الفروض এবং তাদের অবস্থাসমূহ ও প্রাপ্য অংশের আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে এখানে ওয়ারিসদের মধ্যে যারা عصبة হিসেবে মীরাস পাবে তাদের আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আল কুরআনে যে সকল ওয়ারিসের মীরাস প্রাপ্তির নির্দিষ্ট অংশ উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরকে ذوى الفروض বলা হয়। আর ذوى الفروض এর নির্ধারিত অংশ প্রদানের পর মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পায় অথবা ذوى الفروض এর অবর্তমানে সমুদয় সম্পত্তির যারা মালিক হয় তাদেরকে عصبة বলা হয়।

২৯. عصبة (আছাবাহ্) এর শ্রেণী বিভাগ

عصبة প্রথমত ২ প্রকার। (১) العصبة النسبية। অর্থাৎ বংশসূত্রে 'আসাবাহ্, (২) العصبة السببية। অর্থাৎ কারণবশত 'আসাবাহ্।

العصبة السببية। আবার ৩ প্রকার। (ক) العصبة بنفسه। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে 'আসাবাহ্, (খ) العصبة بغيره। অর্থাৎ অন্যের কারণে 'আসাবাহ্ এবং (গ) العصبة مع غيره। অর্থাৎ অন্যের সাথে 'আসাবাহ্।

العصبة بنفسه। অর্থাৎ এমন ধরনের ওয়ারিস, মৃত ব্যক্তির সঙ্গে যার সম্বন্ধ স্থাপনে কোন নারীর মধ্যস্থতা নেই। এতে বুঝা যায় যে, কোন স্ত্রীলোক العصبة। بنفسه হয় না। তাছাড়া নারীর মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ হয়েছে, এমন পুরুষলোকও العصبة بنفسه। হয় না।

৩০. العصبة بنفسه। জাতীয় ওয়ারিসের ৪টি ধারা হতে পারে

(ক) পুত্রীয় ধারা। যেমন, পুত্র, পৌত্র, পুত্রের পৌত্র ও তদনিম্ন পুরুষ এ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

(খ) পিতৃত্বের ধারা। যেমন, পিতা, দাদা, পিতার দাদা ও তদপূর্ব পুরুষ এ ধারার অন্তর্ভুক্ত।

---

৩৯. দেখুন সুনান আবূ দাঊদ।

www.bjilibrary.com

(গ) ভ্রাতৃত্বের ধারা। যেমন আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই, আপন ভাতিজা, বৈমাত্রেয় ভাতিজা ও এদের অধঃস্তন পুরুষ। এ ধারাটি আপন ও বৈমাত্রেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বৈপিত্রেয় ভাই ভাতিজা 'আসাবাহ্ হয় না।

(ঘ) চাচাত ধারা। যেমন পিতার আপন ভাই, পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, পিতার আপন ভাইয়ের পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের পুত্র এবং তাদের অধঃস্তন পুরুষ।

৩১. العصبة بغيره। (অন্যের কারণে 'আসাবাহ্)

মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসের মধ্যে এমন ৪ জন নারী আছে, যারা মূলত ذوى الفروض। এর অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তি যদি পুরুষ জাতীয় 'আসাবাহ্ রেখে যায় এবং তাদের সংগে এ নারীগণও থাকে, তবে সে পুরুষ 'আসাবাহ্র' কারণে এ নারীগণও 'আসাবাহ্ হয়ে যায়।

যেমন : (১) ঔরসজাত কন্যা। নারীদের ৮ জন ذوى الفروض এর মধ্যে কন্যাও একজন। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি পুত্র ও কন্যা দুই-ই রেখে যায়, তবে পুত্রের কারণে কন্যা 'আসাবাহ্ হয়ে যাবে।

(২) পৌত্রী ذوى الفروض এর একজন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পৌত্রের সাথে পৌত্রী থাকলে পৌত্রের কারণে পৌত্রী 'আসাবাহ্ হয়ে যাবে।

(৩) আপন বোন ذوى الفروض এর একজন। শুধু বোন থাকলে সে ذوى الفروض। হিসেবে মীরাস লাভ করবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির ভাই ও বোন উভয় থাকলে ভাইয়ের কারণে বোন 'আসাবাহ্ হয়ে যাবে।

(৪) বৈমাত্রেয় বোনও তদ্রূপ– বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে 'আসাবাহ্ হয়ে যাবে।

উক্ত চার প্রকার মহিলা তাদের ভাইদের কারণে 'আসাবাহ্ হয়। للذكر مثل حظ الانثيين। (পুরুষের জন্য নারীর দ্বিগুণ), এ নীতিতে তাদের মধ্যে মীরাস বন্টন করা হবে।

৩২. العصبة مع غيره। (অন্যের সাথে 'আসাবাহ্)

মৃত ব্যক্তির যদি কন্যা বা পৌত্রী এবং সে সংগে আপন বা বৈমাত্রেয় বোন থাকে– আর তাদের সংগে কোন ভাই না থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে কন্যা বা পৌত্রীর সংগে উক্ত বোন 'আসাবাহ্ হয়। একেই العصبة مع غيره। বলা হয়। ذوى الفروض হিসেবে কন্যার অংশ প্রদানের পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকবে সেটা 'আসাবাহ্

www.bjilibrary.com

হিসেবে বোন পাবে। উল্লেখ্য যে বৈপিত্রেয় বোন কখনো 'আসাবাহ্ হয় না। সে শুধুমাত্র ذوى الفروض হিসেবে মীরাস পায়।

৩৩. ذوى الارحام (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়)

ওয়ারিসদের মধ্যে দূরতম আরো একটি শ্রেণী আছে– সেটিকে ذوى الارحام বলা হয়। এ শ্রেণীর আত্মীয় ذوى الفروض অথবা عصبة হিসেবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হয় না। মৃত ব্যক্তির উক্ত দুই শ্রেণীর আত্মীয়ের অবর্তমানে ذوى الارحام মীরাস লাভ করে। তবে ذوى الفروض এর মধ্যে দুইজন অর্থাৎ স্বামী অথবা স্ত্রী ذوى الارحام এর মীরাস পাবার ব্যাপারে বাধা হয় না। তাদের বর্তমানে মৃত ব্যক্তির অন্য ওয়ারিস না থাকলে (ذوى الفروض অথবা عصبة থেকে) ذوى الارحام শ্রেণীর আত্মীয় মীরাস লাভ করে। ذوى الفروض এর বাদ বাকি ১০ জনের যে কোন একজন অথবা عصبة দের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে ذوى الارحام শ্রেণীর আত্মীয় মীরাস পাবে না।

এ শ্রেণীর আত্মীয়দের মধ্যে রয়েছে মৃত ব্যক্তির কন্যার সন্তান-সন্ততি, পুত্রের কন্যার সন্তান-সন্ততি, নানা, দাদীর পিতা, নানার মা, নানার মায়ের মা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের কন্যা, পৌত্রী, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনের সন্তান-সন্ততি, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের পুত্র, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর বংশধর, ইত্যাদি এ শ্রেণীর আত্মীয়। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন فرائض গ্রন্থ)।

৩৪. العصبة গণের মধ্যে মীরাস বণ্টন পদ্ধতি

উপরে বর্ণিত عصبة গণের মধ্যে সকল শ্রেণীর عصبة যদি জীবিত থাকে অথবা একই শ্রেণীর একাধিক স্তরের যদি জীবিত থাকে, সে ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আহ্ সম্পত্তি বণ্টনের জন্য নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। সুতরাং এ ধরনের অবস্থায় সে নীতি অনুসরণ করে 'আসাবাহ্গণের মাঝে মীরাস বণ্টন করতে হবে। আর সে নীতির মূল কথা হলো : "الاقرب فالاقرب" অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয় প্রথম অগ্রাধিকার (First Preference) পাবে এবং দূরতম আত্মীয় বঞ্চিত হবে।

সুতরাং এ মূলনীতি অনুযায়ী মীরাস লাভ করার ব্যাপারে মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তান (جزء الميت) অগ্রাধিকার পাবে। অতপর তাদের সন্তান (যত নিচেই যাক)। এরপর অগ্রাধিকার পাবে মৃত ব্যক্তির اصل। অর্থাৎ উপরের দিকের আত্মীয় তথা পিতা, দাদা এভাবে উপরের সিঁড়ি। তৃতীয় পর্যায়ে গিয়ে অগ্রাধিকার পাবে

www.bjilibrary.com

মৃত ব্যক্তির পিতার ঔরসজাত সন্তান তথা মৃত ব্যক্তির ভাই, অতপর তাদের সন্তানাদি যত নিচেরই হোক। চতুর্থ পর্যায়ে গিয়ে অগ্রাধিকার পাবে মৃত ব্যক্তির দাদার ঔরসজাত সন্তান তথা চাচা এরপর তাদের সন্তান যত নিচেরই হোক। পরবর্তী পর্যায়ে অগ্রাধিকার দেয়া হবে ঘনিষ্ঠতার ভিত্তিতে। অর্থাৎ একই স্তরের একাধিক 'আসাবাহ্ একত্রিত হলে এ নীতি প্রযোজ্য হবে। এর মানে হচ্ছে- "ان ذا القربتين اولى من ذى قرابة واحدة" এক দিকের সম্পৃক্ততার চেয়ে উভয় দিকের সম্পৃক্ততা অগ্রাধিকার পাবে। যেমন- আপন ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাই-এর মধ্যে আপন ভাই অগ্রাধিকার পাবে, বৈমাত্রেয় ভাই নয়। কেননা আপন ভাই, পিতা ও মাতা উভয় সূত্রে আত্মীয়, কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই শুধু পিতার সূত্রে আত্মীয়, মাতার সূত্রে নয়। কাজেই আপন ভাই যেহেতু ঘনিষ্ঠতার দিক থেকে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের তুলনায় মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটের, তাই মীরাস আপন ভাই-ই লাভ করবে, বৈমাত্রেয় ভাই নয়।

উল্লেখ্য যে, যদি একই শ্রেণীর সমপর্যায়ের একাধিক 'আসাবাহ্ থাকে, কিন্তু তাদের মূল আলাদা আলাদা হয় তখন মূলের ভিত্তিতে নয় বরং মাথাপিছু হারে মীরাস বণ্টন করা হবে। যেমন ভ্রাতৃত্বের ধারার আত্মীয়দের মধ্যে দশ জন আপন ভাতিজা জীবিত আছে। তাদের মধ্যে সাতজন এক ভাইয়ের পুত্র, দুই জন অপর ভাইয়ের পুত্র এবং একজন অপর ভাইয়ের পুত্র। এ অবস্থায় মীরাস বণ্টন করতে গিয়ে কেউ যদি তাদের মূল ধরে তিন ভাগ করে এবং এক এক ভাইয়ের সন্তানদের মধ্যে এক এক ভাগ বণ্টন করে দেয়, তবে সেটা বিধিসম্মত হবে না। বরং বর্তমান জীবিত ওয়ারিস হিসেবে দশ ভাতিজার মধ্যে মাথাপিছু এক ভাগ করে দিতে হবে।

৩৫. 'আসাবাহ্গণের মধ্যে অগ্রাধিকার নীতি

(১) মৃত ব্যক্তির পুত্র, (২) পুত্রের পুত্র বা নাতি, (৩) নাতির পুত্র (ক্রমশ নিচের দিকে), (৪) পিতা, (৫) পিতার পিতা বা দাদা, (৬) দাদার পিতা (ক্রমশ উপরের দিকে), (৭) আপন ভাই, (৮) বৈমাত্রেয় ভাই, (৯) আপন ভাতিজা, (১০) বৈমাত্রেয় ভাতিজা, (১১) আপন চাচা, (১২) বৈমাত্রেয় চাচা, (১৩) আপন চাচাতো ভাই, (১৪) বৈমাত্রেয় চাচাতো ভাই, (১৫) পিতার আপন চাচাতো ভাই, (১৬) পিতার বৈমাত্রেয় চাচাতো ভাই, (১৭) দাদার আপন চাচা, (১৮) দাদার বৈমাত্রেয় চাচা ইত্যাদি।

www.bjilibrary.com

৩৬. العصبة بنفسه। (ব্যক্তিগতভাবে 'আসাবাহ্)-এর অংশ

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, العصبة بنفسه। বলতে মৃত ব্যক্তির ঔরসজাত সন্তানকে বুঝায়, যাকে তার শরীরের অংশও বলা হয় অর্থাৎ পুত্র। পুত্রের নির্ধারিত কোন অংশ নেই। সুতরাং সে সর্বাবস্থায় 'আসাবাহ্। তার স্থান 'আসাবাহ্দের তালিকার সর্বাগ্রে। তার বর্তমানে মৃত ব্যক্তির কন্যা সন্তান ছাড়া অন্য কোনো আত্মীয় 'আসাবাহ্ হিসেবে মীরাস লাভ করতে পারবে না। ذوى الفروض এর হিস্যা প্রদানের পর 'আসাবাহ্ হিসেবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্ট সবটুকু ছেলে পাবে।

এরপর পৌত্রের স্থান। মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকলে পৌত্র এর স্থলাভিষিক্ত হয়। এভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ শ্রেণীর অধঃস্তন কোনো পুরুষ সন্তান থাকবে, সে-ই 'আসাবাহ্ হবে। অন্য শ্রেণীর কেউ মীরাস পাবে না।

এরপর পিতৃত্বের ধারার মধ্যে পিতা, পিতার অবর্তমানে দাদা (এভাবে উপরের দিকে) 'আসাবাহ্ হিসেবে মীরাস পাবে। (নিচের সিঁড়ির কেউ থাকলে উপরের সিঁড়ির কেউ পাবে না)।

এরপর আসবে ভ্রাতৃত্বের ধারা। মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র (যত নিচের হোক) এবং পিতা, পিতামহ (যত উপরের হোক) কেউ জীবিত থাকলে আপন ভাই মীরাস পাবে না। উপরোক্ত কেউ না থাকলে মৃত ব্যক্তির আপন ভাই আসাবাহ্ হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। ভাইয়ের সাথে বোন থাকলে উভয়ই 'আসাবাহ্ হিসেবে ভাই বোনের দ্বিগুণ হিসেবে পাবে। আপন ভাই না থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই আপন ভাইয়ের স্থানে আসবে। বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সাথে বৈমাত্রেয় বোন থাকলে, তখন উপরে বর্ণিত নিয়মে তারাও পাবে। আপন ভাইয়ের বর্তমানে যেমন বৈমাত্রেয় ভাই 'আসাবাহ্ হয় না, তেমনি আপন বোন এবং কন্যার বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই অংশ পায় না।

মৃত ব্যক্তির উপরোক্ত আত্মীয়দের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকলে, তখন আপন ভাতিজা 'আসাবাহ্ হয়। আপন ভাতিজা না থাকলে তখন বৈমাত্রেয় ভাতিজা 'আসাবাহ্ হয়।

৩৭. দাদা-নাতির মীরাস

নাতি মৃত্যুকালে যদি দাদাকে জীবিত রেখে যায়, তবে বাপের অবর্তমানে দাদা মীরাস পাবে, কিন্তু বাপ জীবিত থাকলে দাদা মীরাস পাবে না। কারণ আগেই

www.bjilibrary.com

বলা হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির নিকটতম আত্মীয়ের বর্তমানে দূরতম আত্মীয় বঞ্চিত হয়। অনুরূপভাবে দাদা মৃত্যুবরণ করলে নাতি তার বাপ ও চাচার (মৃত দাদার ছেলের) বর্তমানে মীরাস পাবে না। সাম্প্রতিককালে যদিও এটি একটি আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের 'পারিবারিক আইনে' যদিও ভিন্ন কিছু করা হয়েছে। মূলত: আল্লাহ্‌র আইন পরিবর্তন করার অধিকার কারো নেই।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ج وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا.

'আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবার পর মুমিন পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে আর কোনো এখতিয়ার থাকে না এবং যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের না-ফরমানী করবে, সে প্রকাশ্য গোমরাহীতে নিমজ্জিত হবে।'[৪০]

উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতির কথা ইতিপূর্বেও আমরা আলোচনা করেছি। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُوْنَ.

'পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে।'[৪১] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

الحقوا الفرائض باهلها فما بقى لاولى رجل ذكر.

'ফারাইয বা নির্ধারিত অংশসমূহ হকদারকে প্রদান কর। অতপর অবশিষ্ট অংশ নিকটতম পুরুষদের প্রাপ্য।'[৪২] হাদীসটির সংশ্লিষ্ট টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে :

৪০. সূরা আল আহযাব : ৩৬

৪১. সূরা আন নিসা : ৭

৪২. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাউদ, জামে' আত্ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ, মিশকাতুল মাছাবীহ-باب الفرائض।

www.bjilibrary.com

لاولى رجل ذكر المراد به العصبة واولى بمعنى اقرب اى الى الميت من الولى بمعنى القرب.

অর্থাৎ উক্ত হাদীসে নিকটতম পুরুষ বলে সে 'আসাবাহ্কে বুঝানো হয়েছে, যে মৃত ব্যক্তির সর্বাপেক্ষা বেশি নিকটের।[৪৩]

আল কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে কারীমা এবং উক্ত সহীহ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামে মীরাস লাভের মূল ভিত্তি হচ্ছে জন্মগত সম্পর্ক এবং নিকটাত্মীয়তা।

সুতরাং মৃত ব্যক্তির যদি ছেলে এবং নাতি উভয়ই থাকে (সে নাতি জীবিত ছেলের সন্তান অথবা মৃত ছেলের সন্তান যাই হোক না কেন) এ ক্ষেত্রে নাতি অপেক্ষা ছেলেই যে পিতার নিকটতম পুরুষ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কাজেই কুরআন ও সুন্নাহ্'য় ঘোষিত মূলনীতি অনুযায়ী জীবিত পুত্রই পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে– নাতি নয়।

সাহাবায়ে কিরাম (রা) থেকে শুরু করে অদ্যাবধি মুসলিম উম্মাহ্ বিষয়টি এভাবেই বুঝেছেন। সাহাবীদের মধ্যে ইলমে ফারাইয এর ব্যাপারে যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানী। তিনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, পুত্রের সাথে পৌত্র বা নাতি মীরাস পাবে না।[৪৪]

ইমাম আবু বাকর আল-জাস্সাস্ (রহ)-এর বর্ণনা মতে পুত্রের বর্তমানে পৌত্র যে ওয়ারিস হয় না– এর উপর اجماع الامة। অর্থাৎ উম্মাহ্র ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৪৫]

তবে হ্যাঁ, দাদার ইয়াতীম নাতি ও চাচার ইয়াতীম ভাতিজার বিষয়টি একান্তই মানবিক ও সামাজিক। আল কুরআনে "وصية" ওয়াসিয়াতের বিধান দেয়া হয়েছে। হাদীসেও বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ওয়াসিয়াতের বেলায় কেউ যেন সীমালঙ্ঘন না করে এ ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে যে কোন ব্যক্তি তার খুশি মত ষোল আনা সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ওয়ারিস ব্যতীত অন্য যে কোন লোককে দান করার জন্য ওয়াসিয়াত করে যেতে পারে। সুতরাং এ দান পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বেশি হকদার হচ্ছে দাদার

---

৪৩. দেখুন মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃ. ২৬৩, টীকা-৩

৪৪. দেখুন সহীহ আল বুখারী, ফারাইয অধ্যায়।

৪৫. আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড।

www.bjilibrary.com

ইয়াতীম নাতি। কাজেই দাদা তার মৃত্যুর পূর্বে তার সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নাতির জন্য ওয়াসিয়াত করে যেতে পারে। এ ধরনের নেক 'আমলের জন্য মহান আল্লাহ ইয়াতীম নাতির দাদাকে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। এ মহৎ কাজে চাচা বা চাচাগণ তাদের পিতাকে উৎসাহিত করে তারাও মহান আল্লাহ্র পুরস্কারের অধিকারী হতে পারে। খুব স্বাভাবিকভাবেই দাদা মনে করতে পারেন যে, আমার সে ছেলেটি জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই সে উত্তরাধিকারী হতো। কাজেই নাতিকে ওয়াসিয়াত করে সেটা পূরণ করা যায়। এ মহৎ কাজটি যিনি সম্পাদন করবেন তিনি একজন আদর্শ দাদা হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করবেন। যেসব চাচা এ কাজে সহায়তা করবেন তারাও আদর্শ চাচা হিসেবেই সমাজে স্থান পাবেন। কিন্তু আইন পাশ করে কাউকে জোরপূর্বক এ কাজে বাধ্য করা যাবে না। যাকে যে কাজের অধিকার দেয়া হয়নি, সে অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হওয়া নিতান্তই অবাঞ্ছিত কাজ। এ ব্যাপারে যিনি আইন পাশ করে ফেলেছেন, তিনি হলেন মহান রাব্বুল 'আলামীন। তিনি হলেন احكم الحاكمين। সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক। তাঁর আইনে হস্তক্ষেপ করা নয়– বরং মস্তক অবনত করে তা মেনে নেয়াই হবে বান্দাহ্র কাজ।

কোন দাদা বা কোন চাচা যদি তাদের ইয়াতীম নাতি বা ইয়াতীম ভাতিজার ব্যাপারে নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে পর্যায়ক্রমে আলটিমেটলি সে দায়িত্ব বর্তায় মুসলিম সরকারের উপর।

عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلى قضاؤه ومن ترك مالاً فلورثته وفى رواية من ترك دينا اوضياعًا فلياتنى فانا مولاه وفى رواية من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلاً فالينا. (متفق عليه)

'আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন : আমি মুমিনদের নিকট তাদের জীবনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং কোন মুমিন যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে এবং তা পরিশোধ করার মতো কোন ব্যবস্থা রেখে না যায়, তবে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর কেউ যদি সহায়-সম্পদ রেখে যায় তবে সেটা তার

www.bjilibrary.com

ওয়ারিসদের জন্য। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে : যদি কেউ ঋণ রেখে যায় অথবা অসহায় পরিবার-পরিজন রেখে যায়, তবে আমি তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবো। অন্য আরো একটি বর্ণনায় এসেছে : যদি কেউ সম্পত্তি রেখে যায় তবে তা তার ওয়ারিসদের জন্য। আর যদি কেউ দুস্থ সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তবে তার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করবো।'[৪৬]

সুতরাং মুসলিম সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে দুস্থ, অসহায়, ছিন্নমূল, ইয়াতীম, মিসকীন, বৃদ্ধ ও শিশুসহ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার আদায় করে প্রত্যেকের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় নিরাপদ ও সুষ্ঠু জীবন যাপনের সুব্যবস্থা করা।

মীরাসের বিধান নাযিল করে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করে দিয়েছেন :

فريضة من الله ان الله كان عليما حكيماً.

"এই সব অংশ আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ নিশ্চিতরূপে (সকল ব্যাপারে) ওয়াকিফহাল, মহাবিজ্ঞ।"[৪৭] এই বিধানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে তিনি আরো ঘোষণা করেছেন :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ط وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمِ. وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَه يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ص وَلَه عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

'এই সব হচ্ছে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে লোক আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তাঁকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে এবং এই বাগিচায় সে চিরদিন বসবাস করবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। পক্ষান্তরে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করবে, তাকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। সেখানেই সে চিরকাল অবস্থান করবে। আর এটা তার জন্য অপমানজনক শাস্তি বিশেষ।'[৪৮]

---

৪৬. সহীহ আল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বরাতে মিশকাতুল মাছাবীহ, পৃ. ২৬৩

৪৭. সূরা আন নিসা : ১১

৪৮. সূরা আন নিসা : ১৩, ১৪

www.bjilibrary.com

৩৮. নিরুদ্দেশ (مفقود) ব্যক্তির মীরাস

নিরুদ্দেশ তথা مفقود ব্যক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন :

المفقود هو الغائب الذى لم يدرى موضعة ولم يدرأ حى هو أم ميت.

অর্থাৎ مفقود এমন নিরুদ্দেশ ব্যক্তিকে বলা হয় যার অবস্থান স্থল জানা যায়নি, এমনকি এটাও জানা যায়নি যে, সে কি জীবিত না মৃত।

এমন ব্যক্তির মীরাস প্রসঙ্গে আল্লামা সিরাজী (র:) বলেন

حى فى ماله حتى لايرث منه أحدٌ وميتٌ فى مال غيره حتى لايرث من أحد ويوقف مالُه حتى يصح موته أو تمضى عليه مدةٌ.

অর্থ : নিরুদ্দেশ ব্যক্তি তার নিজস্ব সম্পদের ব্যাপারে জীবিত। তাই অন্য কেউ তার সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে না। আর অন্যের ত্যাজ্য সম্পত্তির ব্যাপারে সে মৃত। তাই অন্যের সম্পদের সে উত্তরাধিকারী হবে না। তার মৃত্যুর সঠিক তথ্য উদঘাটন হওয়া পর্যন্ত অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার সমুদয় সম্পদ বণ্টন স্থগিত রাখতে হবে। এ অপেক্ষমান সময়ে তার সম্পদ সংরক্ষিত রাখা হবে।[৪৯]

অপেক্ষার মেয়াদ :

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ব্যাপারে কত সময় অপেক্ষা করতে হবে এ ব্যাপারে ফকীহ্‌গণ থেকে একাধিক মত পাওয়া যায়। যেমন কেউ বলেছেন ১২০ বছর,[৫০] কেউ বলেছেন ১১০ বছর, কেউ বলেছেন নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্মদিন থেকে ১০৫ বছর, কেউ বলেছেন ৯০ বছর। ظاهر الرواية অনুযায়ী অপেক্ষার মেয়াদ হল "اذا لم يبق أحدٌ من اقرانه حُكم كموته" অর্থাৎ, যদি নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সমবয়স্কদের কেউই জীবিত না থাকে, তবে তাকে মৃত বলে গণ্য করা হবে। আমার (প্রবন্ধকারের) মতে এ মতটি বেশি যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে।

৩৯. যুদ্ধবন্দির মীরাস

কোন মুসলিম যদি কাফিরের হাতে বন্দি হয় তবে তার উত্তরাধিকার স্বত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা লক্ষণীয় :

৪৯. সিরাজী : (فصل فى المفقود)
৫০. এটি ইমাম আবু হানীফা (র:) এর মত বলে জানা যায়।

www.bjilibrary.com

* حكم الاسير كحكم سائر المسلمين فى الميراث ما لم يفارق دينة * অর্থাৎ, সে যদি ইসলাম ত্যাগ না করে, তাহলে মীরাসের ব্যাপারে অন্যান্য মুসলিমের ন্যায় তারও একই হুকুম।

* ان فارق دينه فحكمه حكم المرتدّ * অর্থাৎ, সে যদি ইসলাম ত্যাগ করে ফেলে, তবে, তার ব্যাপারে মুরতাদের হুকুম কার্যকর হবে।

* ان لم تعلم ردته وحياته ولاموته فحكمه حكم المفقود * অর্থাৎ, যদি তার মুরতাদ হওয়া, জীবিতাবস্থায় থাকা অথবা মৃত্যুবরণ করা কোনটাই জানা না যায়, তা হলে তাকে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ন্যায় ধরে নিতে হবে এবং তার মীরাসের ব্যাপারে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মীরাসের হুকুম কার্যকর হবে।[৫১]

৪০. নিমজ্জিত (غرقى), দগ্ধ (حرقى) ও বিধ্বস্ত ব্যক্তির (هدمى) মীরাস প্রসঙ্গে

যে সব লোক নৌকা, স্টীমার, লঞ্চ ইত্যাদি নৌযান নিমজ্জিত হবার কারণে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেছে অথবা একই সাথে অগ্নিদগ্ধ হয়ে অথবা ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণে মৃত্যুবরণ করেছে, এমতাবস্থায় তাদের কার মৃত্যু আগে হয়েছে এবং কার মৃত্যু পরে হয়েছে, তা জানা যায়নি, এমনটি হলে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফে'য়ীর (রহ) মতে এদের মধ্যে পারস্পরিক উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব কার্যকর হবে না। তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি নিজ নিজ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টন করা হবে। তবে কে আগে ও কে পরে মারা গেছে তা যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তাহলে পরে মৃত্যু বরণকারী ব্যক্তি আগে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির মীরাস লাভ করবে।[৫২]

এ ব্যাপারে অবশ্য হযরত আলী (রা) ও ইবন মাস'উদ (রা) থেকে কিছুটা মতপার্থক্যের কথা 'আল্লামা সিরাজী (রহ) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এক সাথে মৃত্যুবরণকারীরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হবে তাদের ইতিপূর্বের সম্পত্তির মধ্যে (নূতন পাওয়ার সম্পত্তির মধ্যে নয়)। যেমন : যায়িদ ও আমর এক সাথে মৃত্যুবরণ করা অবস্থায় যায়িদ আমর থেকে যে সম্পত্তি পেয়েছে, যদি আমর যায়িদ থেকে এ সম্পত্তির ওয়ারিস

---

৫১. সিরাজী فصل فى الاسير। ফতোয়ায়ে 'আসসগীরা, ৬ষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য।
৫২. আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড।

www.bjilibrary.com

হয়, তাহলে এ অবস্থায় আমর তার নিজ সম্পত্তির ওয়ারিস নিজেই হয়ে যাবে– যা কিছুতেই সিদ্ধ হতে পারে না।

প্রত্যেকের প্রকৃত সম্পদের মধ্যে অন্যজনের ওয়ারিস হওয়ার কারণ হল, এক সাথে মৃত্যুবরণকারী মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চিত জীবিত ছিল। একজনের মৃত্যুর সময় অন্যজনের জীবিত থাকা বা জীবিত না থাকা সন্দেহজনক ব্যাপার। আর এ সন্দেহ দ্বারা নিশ্চিত হায়াত শেষ হবে না। কাজেই একে অপরের সম্পদে উত্তরাধিকারী হবে।

৪১. উত্তরাধিকার লাভে প্রতিবন্ধকতা

হুজুব (حُجُبْ) অর্থ প্রতিবন্ধকতা। একজন ওয়ারিশের কারণে অপর একজন ওয়ারিসের মীরাস প্রাপ্তির ব্যাপার বাধাগ্রস্ত হওয়াকে حجب বলে। حجب দু'প্রকার। (১) حجب نقصان অর্থাৎ এমন প্রতিবন্ধকতা যা দ্বারা অংশ হ্রাস পায়। (২) حجب حرمان অর্থাৎ এমন প্রতিবন্ধকতা, যা দ্বারা মীরাস লাভ করা থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

حجب نقصان - এর কারণে অংশ হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি ذوى الفروض-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার সকলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় না। এদের মধ্যে স্বামী, স্ত্রী, মা, পৌত্রী ও বৈমাত্রেয় বোন এই ৫ জন যাবিল ফুরুযের অংশই অন্যের কারণে কমে যায়। যেমন : সন্তান না থাকলে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তার সম্পত্তির $\frac{1}{4}$ পায়; কিন্তু সন্তান থাকলে তা হ্রাস পেয়ে $\frac{1}{8}$ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে মৃত মহিলার সন্তান না থাকলে স্বামী তার تركة এর $\frac{1}{2}$ (অর্ধেক) পায়; কিন্তু সন্তান থাকলে তা হ্রাস পেয়ে $\frac{1}{4}$ পায়। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী-এর জন্যে সন্তান حجب نقصان বা আংশিক প্রতিবন্ধকের কারণ হয়।

মৃত ব্যক্তির পুত্র বা পৌত্র অথবা ২ বা ততোধিক ভাই-বোন না থাকা অবস্থায় মা পায় তার সম্পত্তির $\frac{1}{3}$; কিন্তু এরা থাকলে মা-এর অংশ কমে $\frac{1}{6}$ হয়ে যায়।

মৃত ব্যক্তির কন্যা না থাকা অবস্থায় পৌত্রী পায় $\frac{1}{2}$; কিন্তু কন্যা থাকলে সে পায় $\frac{1}{6}$। সুতরাং পৌত্রীর জন্যে কন্যা حجب نقصان এর কারণ হয়।

অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির যদি আপন বোন না থাকে, কিন্তু বৈমাত্রেয় বোন থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় বোন পায় $\frac{1}{2}$; কিন্তু আপন বোন থাকলে বৈমাত্রেয় বোনের অংশ হ্রাস পেয়ে সে পায় $\frac{1}{6}$।

حجب حرمان অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মীরাস থেকে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। মৃত ব্যক্তির

www.bjilibrary.com

পুত্র, পিতা, স্বামী, কন্যা, মা ও স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য ওয়ারিসগণ অবস্থা ভেদে সম্পূর্ণভাবেও উত্তরাধিকার প্রাপ্তি থেকে বাধাগ্রস্ত হয়। আর তা ذوى الفروض ও 'আসাবাহ্ উভয় প্রকার ওয়ারিসের ব্যাপারে প্রযোজ্য। এটি দু'টোর মূলনীতির ভিত্তিতে হয়ে থাকে।

* প্রথমটি এই যে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির মধ্যস্থতায় ওয়ারিস হয়, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির বর্তমানে সে উত্তরাধিকারী হবে না। তবে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন এর ব্যতিক্রম। তারা মা-এর সাথে উত্তরাধিকারী হবে, যেহেতু মা-এর সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্তির সুযোগ নেই।

حجب حرمان -এর দৃষ্টান্ত : মৃত ব্যক্তির সংগে তার দাদার সম্পর্ক পিতার মধ্যস্থতায় (দাদা মানে পিতার পিতা)। সুতরাং পিতার বর্তমানে দাদা কিছুই পাবে না। পিতার কারণে দাদা মীরাস পাওয়া থেকে সম্পূর্ণভাবে বাধাগ্রস্ত হবে। অনুরূপভাবে পুত্রের বর্তমানে পৌত্র উত্তরাধিকার লাভ করে না।

* দ্বিতীয় মূলনীতিটি হচ্ছে, সর্বাধিক নিকটবর্তী আত্মীয় দ্বারা দূরবর্তী আত্মীয় বঞ্চিত হয়। এই নৈকট্য আত্মীয়তার ধারাভিত্তিক, স্তরভিত্তিক ও শক্তিভিত্তিক–এই তিন ভাবেই হতে পারে।

যেমন পুত্রীয় ধারা পিতৃয় ধারা অপেক্ষা নিকটতর। সুতরাং পুত্রের বর্তমানে পৌত্র উত্তরাধিকার লাভ করে না। এমনিভাবে শক্তির দিক থেকে আপন ভাই বৈমাত্রেয় ভাই অপেক্ষা নিকটতম। কাজেই তার কারণে বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত হবে।

যে ব্যক্তি শর'য়ী কারণে মীরাস থেকে নিজেই বঞ্চিত হয়ে যায়। তার কারণে অন্য ওয়ারিস কখনো বঞ্চিত হয় না। যেমন মুরতাদ (কাফির) অথবা ঘাতক। এরা শর'য়ী কারণে মীরাস থেকে বঞ্চিত; কিন্তু ওরা অন্যকে বঞ্চিত করতে পারবে না। সুতরাং কোন ব্যক্তির ছেলে যদি মুরতাদ হয়ে যায় অথবা তাকে খুন করে, এমতাবস্থায় পিতার যদি ভাই জীবিত থাকে (অর্থাৎ মুরতাদ বা খুনীর চাচা), এ ক্ষেত্রে ফারাইযের নিয়মানুযায়ী পুত্রের বর্তমানে ভাই মীরাস পায় না, যেহেতু ভাই অপেক্ষা পুত্র নিকটতম; কিন্তু এখানে পুত্র মীরাস থেকে বঞ্চিত হবার কারণে ভাই মীরাস পেয়ে যাবে।

৪২. مخارج الفروض ওয়ারিসদের নির্ধারিত অংশ বের করার পদ্ধতি

মহান আল্লাহ্ আল কুরআনে ১২ জন ذوى الفروض এর অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সে নির্ধারিত অংশসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত।

www.bjilibrary.com

প্রথম ভাগ হল : ১/২, ১/৪ ও ১/৮ অংশ। আর দ্বিতীয় ভাগ হল : ২/৩, ১/৩ ও ১/৬ অংশ। উক্ত অংশগুলো এক দিকের বিচারে একটি অন্যটির দ্বিগুণ। আবার অন্যদিকের বিচারে একটি অন্যটির অর্ধেক। যেমন, ১/৮ এর দ্বিগুণ হচ্ছে ১/৪, আবার ১/৪, এর দ্বিগুণ হচ্ছে ১/২। অন্যদিকে ১/২ এর অর্ধেক হচ্ছে ১/৪, আবার ১/৪ এর অর্ধেক হচ্ছে ১/৮ ।। অনুরূপভাবে ১/৬ এর দ্বিগুণ হচ্ছে ১/৩, আবার ১/৩ এর দ্বিগুণ হচ্ছে ২/৩। অন্যদিকে ২/৩ এর অর্ধেক হচ্ছে ১/৩, আর ১/৩ এর অর্ধেক হচ্ছে ১/৬।

উক্ত দুই শ্রেণীতে যে ৬টি অংশ রয়েছে এগুলোর মধ্য থেকে যে কোন একটি অংশ আসলে উক্ত অংশের হর দ্বারা মাসআলা করতে হবে।*

যেমন :

শুধু ১/২ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ২ দ্বারা।
শুধু ১/৪ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৪ দ্বারা।
শুধু ২/৩ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৩ দ্বারা।
শুধু ১/৬ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৬ দ্বারা।
শুধু ১/৮ অংশের প্রাপক থাকলে মাসআলা হবে ৮ দ্বারা।
শুধু ১/৩ অংশের প্রাপক থাকরে মাসআলা হবে ৩ দ্বারা।

১ম শ্রেণীর ২টি বা ৩টি অংশের প্রাপক মিলিত হলে তন্মধ্যে বড়টির হর দ্বারা মাসআলা হবে। যেমন : ১/২ ও ১/৪ মিলিত হলে মাসআলা হবে ৪ দ্বারা, আর ১/২, ১/৪ ও ১/৮ মিলিত হলে মাসআলা হবে ৮ দ্বারা। কারণ ৮ সংখ্যাটি ১/২, ১/৪ ও ১/৮ অংশের مخرج। অর্থাৎ, এখানে ৮ সংখ্যাটিই কেবল মাসআলার মূল বণ্টন সংখ্যা হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

১ম শ্রেণীর ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বেলায়ও একাধিক অংশের প্রাপক একত্রে অংশ প্রাপ্য হলে তন্মধ্যের বড় হর দ্বারা মাসআলা হবে। যেমন, ১/৩ ও ২/৩ একত্রে আসলে ৩ দ্বারা মাসআলা হবে। আবার ১/৩, ২/৩ ও ১/৬ একত্রে আসলে ৬ দ্বারা মাসআলা হবে।

১ম শ্রেণীর ১/২ এর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক অথবা একাধিক অংশের প্রাপক একত্রে মিলিত হলে ৬ দ্বারা মাসআলা হবে।

* এখানে মাসআলা করতে হবে– কথাটির মানে হচ্ছে– উক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা দ্বারা অংশ বণ্টন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

যেমন : নাছিমা মৃত্যুকালে তার স্বামী, মা ও ভাই রেখে যায়। এ অবস্থায় স্বামীর প্রাপ্য অংশ $\frac{১}{২}$, মা-এর অংশ $\frac{১}{৩}$ আর ভাই 'আসাবাহ্ হিসেবে অবশিষ্টাংশ ভোগী। এখানে $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৩}$ এর সাথে মিলিত হওয়ার কারণে ৬ দ্বারা মাসআলা হবে। যেমন :

মাসআলা–৬

মৃত (নাছিমা)	স্বামী	মাতা	ভাই (আসাবাহ্)
	৩	২	১

১ম শ্রেণীর $\frac{১}{৪}$ এর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক অথবা একাধিক অংশের প্রাপক মিলিত হলে মাসআলা হবে ১২ দ্বারা। যেমন :

মাসআলা–১২

মৃত (যায়েদ)	স্ত্রী	মাতা	ভাই(عصبة)
	৩	৪	৫

১ম শ্রেণীর $\frac{১}{৮}$ এর সাথে দ্বিতীয় শ্রেণী এক বা একাধিক অংশ মিলিত হলে মাসআলা হবে ২৪ দ্বারা।

যেমন : মাসআলা–২৪

মৃত (যায়েদ)	স্ত্রী	মাতা	২ কন্যা	চাচা
	৩	৪	১৬	১

উক্ত পদ্ধতির একটি নমুনা নীচে উল্লেখ করা হল :

الفريق الأول (প্রথম দল)		الفريق الثانى (দ্বিতীয় দল)		
$\frac{১}{২}$	+	$\frac{১}{৩}$	মাছআলা	৬ দ্বারা
$\frac{১}{৪}$	+	১/৩	"	১২ "
$\frac{১}{৮}$	+	১/৬	"	২৪ "

উল্লেখ্য যে ذوى الفروض এর অংশসমূহের হরগুলোর ল. সা. গু-ই হচ্ছে মাসআলার সংখ্যা।

www.bjilibrary.com

যেমন : ৬ ও ৩ এর ল. সা. গু. হচ্ছে ৩ | ৬, ৩ = ৩×২×১=৬

২, ১

৮, ৩ ও ৬ এর ল. সা. গু. হচ্ছে ২ | ৮, ৩, ৬

৩ | ৪, ৩, ৩

৪, ১, ১ = ২×৩×৪×১×১= ২৪

৪৩. عول (বর্ধিত সংখ্যার বণ্টননীতি)

ذوى الفروض -এর প্রাপ্যাংশ বণ্টনের বেলায় কখনো এমন হয় যে তাদের নির্দিষ্ট অংশগুলো একত্র করলে তার পরিমাণ পরিত্যক্ত সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যায়– অর্থাৎ, অংশ নির্ণয় সংখ্যাটি মোট অংশ থেকে কমে যায়; এমতাবস্থায় কিছু সংখ্যক ওয়ারিসকে পূর্ণ হিস্‌সা প্রদান করলে অবশিষ্ট কিছু সংখ্যক ওয়ারিসের হিস্‌সা কমে যায় কিংবা তারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধানকল্পে বণ্টনের মূল রাশিকে বৃদ্ধি করে প্রাপ্যাংশ অনুপাতে ওয়ারিসদের মাঝে সম্পত্তি বণ্টন করতে হয়, যাতে ভগ্নাংশ ছাড়াই সকলের অংশ মিলে যায়। এর ফলে প্রত্যেক ওয়ারিসের নির্ধারিত অংশ স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়।

কাজেই উত্তরাধিকার বণ্টনের মূল রাশি বৃদ্ধি ও ওয়ারিসদের নির্ধারিত অংশ হ্রাসকরণকে "عول" ('আউল) বলা হয়।

উল্লেখ্য যে, মাসআলার মূল বণ্টন সংখ্যা সর্বমোট ৭টি। এগুলোর মধ্যে ২, ৩, ৪ ও ৮ এ চারটি সংখ্যায় কখনো 'আউল হয় না।

অবশিষ্ট ৩টি সংখ্যা ৬, ১২ ও ২৪-এ 'আউলনীতি প্রযোজ্য হয়। ৬ সংখ্যাটি ১০ পর্যন্ত জোড় ও বেজোড় সংখ্যায় 'আউল হয়। ১২ সংখ্যাটি ১৭ পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যায় 'আউল হয়। ২৪ সংখ্যাটি শুধুমাত্র ২৭ সংখ্যায় 'আউল হয়।

عول ('আউল) পদ্ধতি নিয়ে অহেতুক প্রশ্ন

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ওয়ারিসদের প্রাপ্যাংশ বণ্টনের সময় অংশ নির্ণয় সংখ্যাটি যদি মোট অংশ থেকে কম হয়ে যায় তখন অংশ নির্ণয় সংখ্যাটি বৃদ্ধি করে মোট অংশের সমান করা অপরিহার্য হয়ে যায়। যেমন : $\frac{৩}{৬} + \frac{৪}{৬} = \frac{৭}{৬} - \frac{৭}{৭}$। এখানে মূল রাশি বা অংশ নির্ণয় সংখ্যা হচ্ছে– ৬, আর মোট অংশ হলো ৭,

www.bjilibrary.com

তাই অংশ নির্ণয় সংখ্যা ৬ কে মোট অংশের সমান করে ৭ করা হয়েছে। এ জন্যে ৭/৬ রূপটি ৭/৭ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ পরিবর্তিত রূপকে 'আউল' বলা হয়।

এ ব্যাপারে ইসলামী গ্রন্থরাজি গবেষণায় দেখা যায় যে, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম নববী, ইমাম আস্ সুয়ূতী[৫৩] তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সর্বপ্রথম "আউল পদ্ধতির" প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় 'উমার (রা) এর শাসনামলে। জনৈকা মহিলা স্বামী ও দু'সহোদরা জীবিত রেখে মৃত্যু বরণ করেন। উক্ত মহিলার স্বামী ও দু'বোন উত্তরাধিকারী হিসেবে 'উমার (রা) এর কাছে অংশ বণ্টন সমস্যার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে আসলে তিনি আল কুরআনের ভাষ্য অনুসারে স্বামীকে সম্পত্তির অর্ধেক এবং দু'বোনকে দু'তৃতীয়াংশ হিসেবে বণ্টন করে দেন।

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ"

'তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তোমরা পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে।'[৫৪]

"فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"

'আর মেয়ে যদি দু'জনের বেশি হয় তবে তারা পরিত্যক্ত সম্পত্তির (২/৩) বা দু'তৃতীয়াংশ পাবে।'[৫৫]

তাই অর্ধেক (১/২) ও দু'তৃতীয়াংশ (২/৩) একত্রে আসার কারণে 'আউলে'র প্রয়োজন হয়।
যেমন : ১/২ + ২/৩ = ৩/৬ + ৪/৬ = ৭/৬- ৭/৭

তবে উক্ত বন্টন সমস্যার সমাধানে আবদুল্লাহ্ ইবনুল আব্বাস (রা) এর অভিমত হচ্ছে : আল্লাহর পবিত্র দীনে "আউল" এর কোনো অবকাশ নেই। তবে স্বামীকে স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ আর দু'বোনকে অবশিষ্টাংশ দিতে হবে। কারণ স্বামীর অংশ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে। তাই আল কুরআনুল কারীমের ভাষ্যানুযায়ী স্বামীকে অর্ধাংশ দিতে হবে। আর দু'বোনের অংশ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়। কখনো তারা অংশীদার হয় না। আবার কখনো তারা

৫৩. ইবনু হাযম : মুহাল্লা গ্রন্থ, ৯/২৬২, ইমাম নববী : আলমাজমূ 'শরহুল মুহাব্বাব' ১৭/১৩৫, ইমাম সুয়ূতী : তারীখুল খুলাফা, ৫৬

৫৪. সূরা আন নিসা : ১২

৫৫. সূরা আন্ নিসা : ১১

www.bjilibrary.com

দুই-তৃতীয়াংশ পায়। আবার কখনো তারা অন্যের কারণে বা অন্যের সাথে "আসাবাহ" হিসেবে আংশিক অংশীধারিণী হয়।

কিন্তু উক্ত মাসআলায় 'উমার (রা) এর অভিমত হচ্ছে : তিনি ইবনুল আব্বাস (রা) কে লক্ষ্য করে বললেন, "ইবনুল আব্বাস, আমি তো তাদের মাঝে পার্থক্য করতে পারছি না। কাকে আল্লাহ্ তা'আলা অধিকার দিয়েছেন আর কাকে দেননি, তাই তাদের মাঝে 'আউল পদ্ধতিতে বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো। যাতে প্রত্যেকেই আল কুরআনের ভাষ্য অনুসারে তার নির্ধারিত অংশ পেতে পারে।" তাঁর এ সিদ্ধান্ত সকলে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন। পরবর্তীতে ইসলামী মনীষীগণও তা অকপটে মেনে নিয়েছেন। আর 'আউল পদ্ধতি, কোন নতুন প্রসঙ্গ নয়, বরং গোটা ইসলামী উম্মাহ্ 'উমার (রা) এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছেন। এখানে অবশ্য ইবনুল আব্বাস (রা) এর মতামত গ্রহণ করারও অবকাশ ছিল।

৪৪. تماثل، تداخل، توافق ও تباين প্রসঙ্গ

'তামাসুল' বলা হয় এমন দু'টো সংখ্যাকে যার একটি অপটির সমান। যেমন, ৩, ৩ ও ৫, ৫। এখানে ৩ ও ৩ সমান সমান। ৫ ও ৫ অনুরূপ।

'তাদাখুল' বলা হয় এমন দু'টো সংখ্যাকে যার একটি অপেক্ষা অন্যটি বড়– তবে ছোট সংখ্যাটি দ্বারা বড় সংখ্যাটি বিভাজ্য। যেমন, ৫ ও ২০ অথবা ৪ ও ২০। ৪ অথবা ৫ দ্বারা ২০ সংখ্যাটিকে ভাগ করলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

'তাওয়াফুক' বলা হয় এমন ২ সংখ্যাকে, যার ছোটটি দ্বারা বড়টিকে ভাগ করা যায় না বটে; কিন্তু তৃতীয় কোন সংখ্যা দ্বারা উভয়টিকে ভাগ করা যায়। যেমন, ৮ ও ২০। উভয় সংখ্যাকে তৃতীয় সংখ্যা ৪ দ্বারা ভাগ করা যায়। অনুরূপভাবে ৬ ও ৮ কে ২ দ্বারা ভাগ করা যায়।

'তাবায়ুন' বলা হয় এমন ২ সংখ্যাকে, যাদের অপর কোন ভাজক নেই। যেমন, ৯ ও ১০, ৮ ও ১১, ৫ ও ৯।

৪৫. التصحيح (তাছহীহ্)

এর আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধকরণ। আর ফারাইযের পরিভাষায় এর অর্থ হচ্ছে "هو إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرؤس" অর্থাৎ, প্রাপকদের সংখ্যা এবং তাদের প্রাপ্য অংশসমূহের মধ্যে ভগ্নাংশ দূরীভূত করে সমন্বয় সাধন করা। একাধিক ওয়ারিসের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশ দেখা দিলে এমন কোন ক্ষুদ্রতম

www.bjilibrary.com

সংখ্যা দ্বারা অংশ বের করা অনিবার্য হয়ে পড়ে যদ্বারা সকল ওয়ারিসের অংশসমূহ ভগ্নাংশ ছাড়াই সুন্দর ও সঠিকভাবে মিলে যায়।

এ বিষয়ে ৭টি মূলনীতি জানা প্রয়োজন। তম্মধ্যে ৩টি প্রাপ্ত অংশ ও ওয়ারিসগণের সংখ্যা হিসেবে। বাকী ৪টি কেবল ওয়ারিসগণের সংখ্যা হিসেবে স্থিরীকৃত। প্রথম ৩টি নিয়ম নিম্নরূপ :

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ যদি তাদের মোট সংখ্যা অনুযায়ী সঠিকভাবে মিলে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে تصحيح নিষ্প্রয়োজন। যেমন :

মাসআলা–৬

মৃত–	পিতা	মাতা	কন্যা ২ জন
	১	১	৪

উক্ত মাসআলা পিতা-মাতা প্রত্যেকে ১/৬ করে এবং ২ কন্যা ২/৩ তথা ৪/৬ অর্থাৎ, প্রত্যেক কন্যা ২/৬ করে পায়। সুতরাং এখানে ওয়ারিসদের অংশগুলো ভগ্নাংশ ব্যতীত তাদের মাঝে সঠিকভাবে বণ্টন করা সম্ভব বিধায় গুণের প্রয়োজন নেই। কারণ ২ কন্যার প্রাপ্ত অংশ ৪। এখানে অংশ ও সংখ্যার মাঝে تداخل বিদ্যমান। এখানে যদি ২ কন্যার স্থলে ৪ কন্যাও হয় তা হলেও অংশ ও সংখ্যার মাঝে تماثل হত। কাজেই এখানে ভগ্নাংশ ব্যতীত তাদের মাথাপিছু সুষ্ঠু বণ্টন সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, এ মাসআলায় تصحيح এর প্রয়োজন হয় না বিধায় অনেকে এটিকে تصحيح এর মধ্যে গণ্য না করে ৬টি মূলনীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

(২) তাছহীহ্ -এর ২য় মূলনীতি হচ্ছে, যদি ওয়ারিসগণের এক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ তাদের মাথাপিছু ভগ্নাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয়; কিন্তু যদি তাদের জনসংখ্যা ও প্রাপ্ত অংশের মাঝে توافق (গ.সা.গু.)-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তা হলে যাদের প্রাপ্ত অংশ ভগ্নাংশ হয়েছে তাদের সংখ্যার وَفْق (উৎপাদক) দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করতে হবে। আর যদি মাসআলা 'আউলী হয় তা হলে عول (বর্ধিত সংখ্যা)-এর মধ্যে গুণ করতে হবে। যেমন : (ক) পিতা-মাতা ও ১০ কন্যা, (খ) স্বামী, পিতা-মাতা ও ৬ কন্যা।

"ক" এর উদাহরণ : মাসআলা– ৬ তাছহীহ্ (৬×৫) = ৩০

মৃত–	পিতা	মাতা	কন্যা ১০জন (وفق -৫)
	১/৫	১/৫	৪/২০

www.bjilibrary.com

উক্ত মাসআলাটিকে তাছহীহ্ করার পূর্বে ওয়ারিসগণের প্রাপ্ত অংশ ছিল নিম্নরূপ :

عدد رؤس - জনসংখ্যা	سهام - প্রাপ্ত অংশসমূহ
পিতা	১
মাতা	১
কন্যা ১০জন	৪ (ভগ্নাংশ)

"খ" এর উদাহরণ : মাসআলা–১২ 'আউল–১৫ তাসহীহ্– ৪৫

মৃত–	স্বামী	পিতা	মাতা	কন্যা ৬জন (وفق -৩)
	৩	২	২	৮
	৯	৬	৬	২৪

(৩) تصحيح -এর তৃতীয় মুলনীতি হচ্ছে, যদি ওয়ারিসদের কোন এক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ এবং তাদের জনসংখ্যা-এর মধ্যে ভগ্নাংশ ব্যতীত বন্টন করা সম্ভব না হয়, আর এ অবস্থায় উক্ত ওয়ারিসদের সদস্য সংখ্যা ও প্রাপ্ত অংশসমূহের মধ্যে توافق-এর সম্পর্কে বিদ্যমান না থাকে; বরং تباين পরিলক্ষিত হয়, তাহলে যাদের অংশ ভগ্নাংশ হয়, তাদের সম্পূর্ণ সদস্য সংখ্যা দ্বারা মাসআলা অথবা عول হলে 'আউলকে গুণ করতে হবে।

যেমন : "ক" এর উদাহরণ : মাসআলা– ৬ তাছহীহ্ (৬×৫) = ৩০

মৃত–	পিতা	মাতা	কন্যা ৫জন (وفق -৫)
	১/৫	১/৫	৪/২০ (ভগ্নাংশ)

(খ) عول বিশিষ্ট মাসআলার দৃষ্টান্ত :

মাসআলা–৬ 'আউল– ৭ তাছহীহ্– ৩৫

মৃত–	স্বামী	সহদোরা ৫ জন
	৩	৪
	১৫	২০ (ভগ্নাংশ)

تصحيح -এর অবশিষ্ট ৪টি মূলনীতির প্রথমটি হচ্ছে, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর ওয়ারিসদের অংশে ভগ্নাংশ আসে, আর এ অবস্থায় অংশ প্রাপ্ত ওয়ারিসদের সদস্য সংখ্যার মাঝে تماثل তথা পারস্পরিক সমতা-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে যে কোন এক শ্রেণীর ওয়ারিসের সদস্য সংখ্যা দ্বারা মাসআলাকে গুণ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

যেমন : মাসআলা–৬ তাছহীহ্– (৬×৩) = ১৮

মৃত–	কন্যা ৬ জন (وفق-৩)	দাদী ৩ জন	চাচা ৩ জন
	৪	১	১
	১২	৩	৩

تصحيح-এর পঞ্চম মূলনীতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর ওয়ারিসদের সংখ্যার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গৃহীত ৪টি মূলনীতির দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর ওয়ারিসদের অংশে ভগ্নাংশ আসে, আর এ অবস্থায় ওয়ারিসদের এক শ্রেণীর সংখ্যার সাথে অন্য শ্রেণীর সংখ্যার تداخل-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে ওয়ারিসদের বড় সদস্য সংখ্যা দ্বারা মাসআলাকে গুণ করতে হবে।

যেমন : মাসাআলা– ১২ তাছহীহ্ (১২×১২) = ১৪৪

মৃত–	স্ত্রী ৪ জন	দাদী ৩ জন	চাচা ১২ জন
	৩	২	৭
	৩৬	২৪	৮৪

تصحيح এর ৬ষ্ঠ তথা অবশিষ্ট চারটি মূলনীতির মধ্যে তৃতীয়টি হচ্ছে, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর অংশে ভগ্নাংশ হয়, আর এ অবস্থায় উত্তরাধিকারীদের সংখ্যায় توافق এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(ক) এক শ্রেণীর সংখ্যার وفق কে দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করতে হবে।

(খ) অতঃপর প্রাপ্ত গুণফলকে তৃতীয় শ্রেণীর সংখ্যার وفق-এ গুণ করতে হবে, যদি এদের মাঝে توافق-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে।

(গ) যদি توافق-এর সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকে, বরং تباين এর সম্পর্ক থাকে, তবে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যার সাথে গুণ করতে হবে। অনুরূপ নিয়মে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত গুণ করতে হবে।

(ঙ) সর্বশেষ যে গুণফল দাঁড়াবে, তা দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করতে হবে। যেমন : ওয়ারিসদের সংখ্যা যদি হয় ৪ স্ত্রী, ১৮ কন্যা, ১৫ দাদী এবং ৬ চাচা।

মাসআলা–২৪ তাছহীহ্–(২৪×১৮০) = ৪৩২০

মৃত–	৪ স্ত্রী	১৮ কন্যা	১৫ দাদী	৬ চাচা
	৩	১৬	৪	১
	৫৪০	২৮৮০	৭২০	১৮০

www.bjilibrary.com

উল্লেখ্য যে, উক্ত মাসআলায় تصحيح-এর সহজ নিয়ম হচ্ছে, ওয়ারিসগণের সংখ্যা সমূহের ল.সা.গু. বের করে তা মূল মাসআলায় গুণ করতে হবে। যেমন :

২	৪,	১৮,	১৫,	৬
৩	২,	৯,	১৫,	৩
	২,	৩,	৫,	১

সুতরাং নির্ণেয় ল.সা.গু (২×৩×২×৩×৫×১) = ১৮০

অতএব নির্ণেয় তাছহীহ্ (১৮০×২৪)--- = ৪৩২০

تصحيح-এর সপ্তম তথা শেষ চার প্রকারের চতুর্থতম মূলনীতি হচ্ছে, যদি দুই বা ততোধিক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীদের অংশে ভগ্নাংশ হয় এবং এমতাবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিসগণের সংখ্যার মধ্যে পরস্পর تباين-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে, তাহলে প্রথমে যে কোন এক শ্রেণীর সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করতে হবে। অনুরূপভাবে অর্জিত গুণফল দ্বারা চতুর্থ শ্রেণীর পূর্ণ সংখ্যায় গুণ করতে হবে। সর্বশেষ প্রাপ্ত গুণফলকে মূল মাসআলায় গুণ করে তাছহীহ্ করতে হবে। যেমন : ২ স্ত্রী, ৬ দাদী, ১০ কন্যা ও ৭ চাচা।

মাসআলা–২৪ তাছহীহ্- (২৪×২১০) = ৫০৪০

মৃত–	২ স্ত্রী	৬ দাদী	১০ কন্যা	৭ চাচা
	৩	৪	১৬	১
	৬৩০	৮৪০	৩৩৬০	২১০

উক্ত মাসআলায় স্ত্রীগণ ১/৮, কন্যাগণ ২/৩, দাদীগণ ১/৬ পায়, আর চাচাগণ 'আসাবাহ্ হয়। ৮, ৩, ৬ এর ল.সা.গু. হল ২৪। সুতরাং মূল মাসআলা হল ২৪ দ্বারা। এখন ৬ দাদীর অংশ ৪ توافق-এর সম্পর্ক, ৬ এর وفق হচ্ছে-৩, আর ১০ কন্যার অংশ ১৬ توافق-এর সম্পর্ক, ১০-এর وفق হচ্ছে-৫। এখন অংশীদারগণের সংখ্যা দাঁড়াল ২, ৩, ৫, ৭-এ।

উক্ত সংখ্যাগুলোর পরস্পরের সাথে تباين-এর সম্পর্ক বিদ্যমান। সুতরাং নির্ণেয় তাছহীহ্ (২×৩×৫×৭) × মূল মাসআলা বা ২১০×২৪ = ৫০৪০

তাছহীহ্ থেকে ওয়ারিসদের প্রত্যেক শ্রেণী ও সদস্যের অংশ জানার পদ্ধতি :

تصحيح থেকে ওয়ারিসদের প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক সদস্য কে কত পেল এ

www.bjilibrary.com

সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লামা সিরাজী (রহ) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

"وإذَا أردت أن تعرف نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان لكل فريق من أصل المسئلة فى ما ضربته فى أصل المسئلة فما حصل كان نصيب ذلك الفريق وإذا أردت أن تعرف نصيب كل واحدٍ من احادِ ذلك الفريق فاقسم ما كان لكل فريق من أصل المسئلة على عدد رؤسهم ثم اضرب الخارج فى المضروف فالحاصل نصيب كل واحد من احاد ذلك الفريق".

অর্থাৎ তাছহীহ্ থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য অংশ জানতে হলে, প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ মূল মাসআলা থেকে যে অংশ পেয়েছে তাকে গুণ করতে হবে ঐ সংখ্যার সাথে যা দ্বারা মূল মাসআলায় গুণ করা হয়েছিল। অতঃপর এ অর্জিত গুণফলই উক্ত শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ। (এ হচ্ছে ওয়ারিসগণের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্ত অংশ জানার পদ্ধতি)।

আর ঐ শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেকের অংশ আলাদাভাবে জানতে হলে, প্রত্যেক শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণ মূল মাসআলা থেকে যে অংশ পেয়েছে তাকে তাদের অংশীদারদের (সদস্য) সংখ্যা দ্বারা ভাগ করতে হবে। অতঃপর ভাগফলকে مضروب (যা দ্বারা মূল মাসআলাকে গুণ করা হয়েছে)-এর মধ্যে গুণ করতে হবে। তবেই উক্ত শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাপ্ত অংশ আলাদাভাবে বেরিয়ে আসবে।

نصيب كل فريق তথা প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ জানার একটি উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

	মাসআলা–২৪		তাছহীহ্ - ৫০৪০ (مضروب - ২১০)	
মৃত–	২ স্ত্রী	৬ দাদী	১০ কন্যা	৭ চাচা
	৩	৪	১৬	১
	৬৩০	৮৪০	৩৩৬০	২১০

এখানে উত্তরাধিকারীগণের মূল মাসআলা থেকে প্রাপ্ত অংশ ৩, ৪, ১৬ ও ১-কে

www.bjilibrary.com

২১০ দ্বারা গুণ করা হয়েছে, যা দ্বারা মূল মাসআলায় গুণ করে তাছহীহ্ করা হয়েছিল। সুতরাং উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রাপ্য অংশ হল :

২ স্ত্রী (৩×২১০) = ৬৩০
৬ দাদী (৪×২১০) = ৮৪০
১০ কন্যা (১৬×২১০) = ৩৩৬০
৭ চাচা (১×২১০) = ২১০
মোট = ৫০৪০

نصيب كل واحد তথা উত্তরাধিকারীগণের প্রত্যেকের অংশ স্বতন্ত্রভাবে জানার ১টি পদ্ধতি নিম্নরূপ :

মাসআলা–১২ তাছহীহ্ ১৪৪ (مضروب - ১২)

মৃত–	৪ স্ত্রী	৩ দাদী	১২ চাচা
	৩	২	৭
	৩৬	২৪	৮৪

رؤس সদস্য সংখ্যা	سهام অংশ	كل فرد প্রত্যেক সদস্য
৪ স্ত্রী	৩৬	৩/৪ × ৩/১২ = ৯
৩ দাদী	২৪	২/৩ × ৪/১২ = ৮
১২ চাচা	৮৪	৭/১২ × ১/১২ = ৭

আলাদাভাবে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ = ৯ × ৪ = ৩৬
আলাদাভাবে প্রত্যেক দাদীর প্রাপ্য অংশ = ৮ × ৩ = ২৪
আলাদাভাবে প্রত্যেক চাচার প্রাপ্য অংশ = ৭ × ১২ = ৮৪
মোট = ১৪৪

উল্লেখ্য যে تصحيح থেকে আলাদাভাবে প্রত্যেক ওয়ারিসের প্রাপ্য অংশ বের করার ভিন্ন পদ্ধতিও আছে। বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন 'সিরাজী'।

৪৬. الردُّ (রদ্দ)

'রদ্দ' প্রসঙ্গে আল্লামা সিরাজী (রহ) বলেন :

www.bjilibrary.com

"الردُّ ضد العول ما فَضُلَ عن فرض ذوى الفروض ولامستحق له يردُّ على ذوى الفروض بقدر حقوقهم..."

অর্থাৎ 'রদ্দ' হচ্ছে 'আউলের বিপরীত। ذوى الفروض-এর নির্ধারিত অংশ সমূহ প্রদানের পর যদি সম্পত্তির কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়, আর এ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কোন عصبة না থাকে, তবে সে অবশিষ্ট অংশ ذوى الفروض-এর মধ্যে তাদের প্রাপ্যাংশ অনুপাতে পুনর্বণ্টন করতে হবে এবং এটা করতে হবে মূল রাশিকে কমিয়ে, যদ্দরুন ওয়ারিসদের অংশ বেড়ে যায়। সুতরাং মোদ্দা কথা হচ্ছে, সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে মূল রাশিকে হ্রাস ও ওয়ারিসদের অংশ বৃদ্ধিকরণকে 'ইলমে ফারাইযের পরিভাষায় 'রদ' (الردُّ) বলে। তবে اصحاب الفروض-এর দুই সদস্য স্বামী ও স্ত্রী কখনো পুনর্বণ্টনে উদ্বৃত্ত অংশ প্রাপ্তির আওতায় পড়ে না। অনুরূপভাবে পিতা ও দাদা অবস্থার প্রেক্ষিতে اصحاب الفروض-এর অন্তর্ভুক্ত হলে তারাও রদ্দের আওতায় পড়ে না। কারণ তারা عصبة হিসেবে অবশিষ্ট সম্পত্তি পেয়ে যায়।

এটাই অধিকাংশ সাহাবীর (রা) অভিমত। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ এ মতেরই অনুসারী। কিন্তু হযরত যায়িদ ইবনু সাবিত (রা) এর অভিমত হচ্ছে উদ্বৃত্ত সম্পত্তি বাইতুল মাল অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে। ইমাম মালিক (রহ) ও ইমাম শাফিয়ী (রহ) এ মতের অনুসারী।

الرَّدُّ-এর প্রকারভেদ :

الرد-তথা পুনর্বণ্টন সম্পর্কীয় মাসআলা চার প্রকার।

প্রথম প্রকার : যদি কোন মাসআলায় من لا يُرَدُّ عليه তথা স্বামী-স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে اصحاب الفرائض-এর মধ্য থেকে এক শ্রেণীর অংশীদার থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে عدد رؤس-অর্থাৎ অংশীদারদের মাথার সংখ্যাই হবে সংশ্লিষ্ট مسئلة ردية। যেমন, কেউ যদি ২ কন্যা রেখে মারা যায়, এ অবস্থায় তাদের নির্ধারিত অংশ হচ্ছে $\frac{২}{৩}$। কোন عصبة না থাকার কারণে অবশিষ্ট $\frac{১}{৩}$ অংশ তারাই পাবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে পুনর্বণ্টন না করে বরং প্রথমেই মূল রাশি ৩-এর পরিবর্তে কন্যাদের মাথার সংখ্যা অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

উদাহরণ : মৃত مسئلة ردية-২

কন্যা	কন্যা
১	১

দ্বিতীয় প্রকার : যদি কোন মাসআলায় স্বামী-স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে اصحاب الفرائض-এর মধ্য থেকে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার থাকে, তা হলে তাদের سهام বা প্রাপ্যাংশের সমষ্টিই হবে সংশ্লিষ্ট مسئلة ردية। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মাসআলার $\frac{১}{৬}$ এর প্রাপক ২ জন থাকলে মাসআলা ২ দ্বারা নিষ্পন্ন করতে হবে। আর যদি $\frac{১}{৩}$ অংশের প্রাপক ১ জন এবং $\frac{১}{৬}$ অংশের প্রাপক ১ জন থাকে তবে ৩ দ্বারা নিষ্পন্ন করতে হবে। আর যদি $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ অংশের প্রাপক একত্রে মিলিত হয় তবে ৪ দ্বারা নিষ্পন্ন করতে হবে। আর ৫ দ্বারা মাসআলা নিষ্পন্ন করতে হবে যদি $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৬}$ অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৬}$ অথবা $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৩}$ অংশের প্রাপক একত্রে মিলিত হয়।

তৃতীয় প্রকার : যদি مَن يُرَدُّ-এর সাথে مَن لاَ يُرَدُّ অর্থাৎ যাদের মধ্যে রদ্দ হয় তাদের সাথে যাদের মধ্যে রদ্দ হয় না (যেমন : স্বামী-স্ত্রী) এ উভয় প্রকার ওয়ারিস একত্রে মিলিত হয়, তবে যাদের মধ্যে রদ্দ হয় না তাদের সর্বনিম্ন مخرج থেকে তাদের অংশ বের করে দিতে হবে। অতঃপর যদি অবশিষ্ট অংশ যাদের মধ্যে রদ্দ হয়, তাদের মাথাপিছু সমানভাবে হয়ে যায় তবে এখানে সমস্যার অবসান হয়ে যাবে। যেমন- স্বামী ও ৩ কন্যা। আর যদি সমান ভাবে বণ্টিত না হয় তা হলে যাদের মধ্যে রদ্দ হয় তাদের সদস্য সংখ্যার وفق দ্বারা যাদের মধ্যে রদ্দ হয় না তাদের مخرج অর্থাৎ মাসআলা গুণ করতে হবে; যদি তাদের সদস্য সংখ্যাও অবশিষ্টাংশের মধ্যে توافق-এর সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যেমন : স্বামী ও ৬ কন্যা। আর যদি توافق-এর সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকে, তবে مَن يُرَدُّ عليه শ্রেণীর ওয়ারিসগণের পূর্ণ সদস্য সংখ্যা দ্বারা مَن يُرَدُّ عليه শ্রেণীর ওয়ারিসদের مخرج কে গুণ করতে হবে। অতঃপর অর্জিত গুণফল উক্ত মাসআলার تصحيح হবে। যেমন : স্বামী ও ৫ কন্যা।

চতুর্থ প্রকার : যদি কোন মাসআলায় স্বামী বা স্ত্রীর সাথে اصحاب الفرائض-এর মধ্য থেকে একাধিক শ্রেণীর অংশীদার থাকে, তা হলে প্রথমত স্বামী অথবা স্ত্রীর নির্ধারিত অংশের সর্বনিম্ন مخرج দ্বারা مسئلة ردية করতে হবে। অতঃপর স্বামী বা স্ত্রীকে নির্ধারিত অংশ প্রদান করে অবশিষ্ট অংশ হাতে রাখতে হবে। দ্বিতীয় অবশিষ্ট অংশীদারের মাঝে তৃতীয় প্রকারের ন্যায় مسئلة ردية করতে হবে।

www.bjilibrary.com

এবার দেখতে হবে, হাতে রাখা অংশ এবং দ্বিতীয় مسئلة ردية সমান সমান কিনা; যদি সমান সমান হয়ে যায়, তা হলে সমস্যা এখানেই শেষ। আর সমান সমান না হলে দ্বিতীয় مسئلة ردية দ্বারা প্রথম مسئلة ردية কে এবং স্বামী-স্ত্রীর অংশকে গুণ করতে হবে। তারপর হাতে রাখা সংখ্যা দিয়ে অবশিষ্ট অংশীদারদের অংশকে গুণ করতে হবে।

যেমন : 4 স্ত্রী, ৯ কন্যা ও ৬ দাদী

মাসআলা ৮ (১) তাছহীহ্-৪০ (২) তাছহীহ্- ১৪৪০ مضروب ৩৬

মৃত–	৪ স্ত্রী	৯ কন্যা	৬ দাদী
	১/৮		
	৫	২৮	৭
	১৮০	১০০৮	২৫২

(১) تصحيح ৪০

ওয়ারিস	অংশ	প্রাপ্ত অংশ
৪ স্ত্রী	~~৪০~~ ৫ এর ১/~~৮~~ =	৫
৯ কন্যা	~~৩৫~~ ৭ এর ৪/~~৫~~ =	২৮
৬ দাদী	~~৩৫~~ ৭ এর ১/~~৫~~ =	৭

(২) تصحيح-১৪৪০

ওয়ারিসগণ	প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ	প্রতিজনের অংশ
৪ স্ত্রী	৩৬×৫ = ১৮০	১৮০÷৪ = ৪৫
৯ কন্যা	৩৬×২৮ = ১০০৮	১০০৮÷৯ = ১১২
৬ দাদী	৩৬×৭ = ২৫২	২৫২÷৬ = ৪২
	মোট = ১৪৪০	

৪৭. المناسخة।

মুনাসাখা মানে স্থানান্তরিত করা। ইলমে ফারাইযের পরিভাষায় ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের পূর্বে কোন ওয়ারিসের মৃত্যুর ফলে তার অংশ তার ওয়ারিসদের নিকট স্থানান্তর করণকে মুনাসাখা বলা হয়।

www.bjilibrary.com

এর পদ্ধতি হল, প্রথম মৃত ব্যক্তির মাসআলাকে তাছহীহ্ করতে হবে। এ তাছহীহ্ হতে প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ প্রদান করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির মাসআলা তাছহীহ্ করতে হবে এবং প্রথম তাছহীহ্ হতে হাতে প্রাপ্ত অংশ ও দ্বিতীয় তাছহীহ্ হতে ৩টি অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করতে হবে। প্রথম তাছহীহ্ হতে প্রাপ্ত যে অংশ হাতে আছে তা যদি দ্বিতীয় তাছহীহ্-এর উপর সঠিকভাবে বণ্টন হয়, তবে আর গুণ করার প্রয়োজন নেই। আর সঠিকভাবে বণ্টন না হলে লক্ষ্য করতে হবে উভয়ের মধ্যে কিসের সম্পর্ক; যদি تـوافـق-এর সম্পর্ক হয়, তা হলে দ্বিতীয় তাছহীহ্-এর উৎপাদক দ্বারা প্রথম তাছহীহ্কে গুণ করতে হবে। আর যদি উভয়ের মধ্যে تـبـايـن-এর সম্পর্ক হয়, তা হলে দ্বিতীয় তাছহীহ্-এর পূর্ণ সংখ্যা দ্বারা প্রথম তাছহীহ্-এর পূর্ণ সংখ্যাটি গুণ করতে হবে। এতে অর্জিত গুণফল উভয় মাসআলার مـخـرج বণ্টন সংখ্যা হবে। অতঃপর প্রথম মৃতের ওয়ারিসগণের অংশকে مـضـروب অর্থাৎ দ্বিতীয় তাছহীহ্ অথবা তার উৎপাদকে গুণ করতে হবে। আর দ্বিতীয় মৃতের ওয়ারিসগণের অংশকে مـا فـى الـيـد-এর সম্পূর্ণ সংখ্যায় অথবা তার উৎপাদককে গুণ করতে হবে। আর যদি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ওয়ারিস মারা যায়, অংক করার ক্ষেত্রে গুণফলকে প্রথম স্থানে এবং তৃতীয় মাসআলাকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে অংক করতে হবে। অতঃপর চতুর্থ ও পঞ্চম যতই হোক না কেন, এ নিয়মে চলবে।

যেমন : কেউ স্বামী, কন্যা ও মাতা রেখে মারা গেল, অতঃপর মীরাস বণ্টনের পূর্বে স্বামী এক স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে মারা গিয়েছে, অতঃপর মীরাস বণ্টনের পূর্বে কন্যা দুই পুত্র, এক কন্যা ও এক দাদী রেখে মৃত্যুবরণ করল, অতঃপর দাদী তার স্বামী ও দুই ভাই রেখে মৃত্যুবরণ করল।

	মাসআলা–৪ (রদ্দ)	তাছহীহ্-১৬	তাছহীহ্-৩২	তাছহীহ্-১২৮
মৃত (মারইয়াম)	মাতা (আমেনা)		কন্যা (হালীমা)	স্বামী (নাছীর)
	৩ ৬ ২৪		৯ মৃত	১ ৪ মৃত

	মাসআলা–৪	হাতে আছে-৪	(تماثل)
মৃত (নাছীর)	পিতা (সালেম)	মাতা (ফাতিমা)	স্ত্রী (কুলসুম)
	২ ৪ ১৬	১ ২ ৮	১ ২ ৮

www.bjilibrary.com

মাসআলা–৬ হাতে আছে-৯ (توافق بالثلث)

মৃত (হালীমা)	পুত্র (মামুন)	পুত্র (হারেস)	কন্যা (রুকাইয়া)	দাদী (হাফসা)
	২	২		১
	৬ ২৪	৬ ২৪	৩ ১২	১ ৩ (মৃত)

মাসআলা–২ তাছহীহ্-৪ হাতে আছে-৩

মৃত (হাফসা)	স্বামী (ফারুক)	ভাই (হারুন)	ভাই (সাদিক)
	২ ৬	১ ৩	১ ৩

<u>المبلغ-১২৮</u>

জীবিত ওয়ারিসগণ	প্রাপ্যাংশ
১। আমেনা	২৪
২। সালেম	১৬
৩। ফাতেমা	৮
৪। কুলসুম	৮
৫। মামূন	২৪
৬। হারেস	২৪
৭। রুকাইয়া	১২
৮। ফারুক	৬
৯। হারুন	৩
১০। সাদিক	৩
	১২৮

মনে করি (বন্টনযোগ্য) ত্যাজ্য সম্পত্তির পরিমাণ ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা।

জীবিত ওয়ারিসগণের প্রাপ্যাংশ নিম্নরূপ :

জীবিত ওয়ারিসগণের নাম	প্রাপ্যাংশ
১। আমেনা	৫০,০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ২৪ = ৯,৩৭৪/= টাকা
২। সালেম	৫০,০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ১৬ = ৬,২৫০/= টাকা

www.bjilibrary.com

৩। ফাতেমা ৫০,০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ৮ = ৩,১২৫/= টাকা

৪। কুলসুম ৫০.০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ৮ = ৩,১২৫/= টাকা

৫। মামূন ৫০.০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ২৪ = ৯,৩৭৫/= টাকা

৬। হারেস ৫০.০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ২৪ = ৯,৩৭৫/= টাকা

৭। রুকাইয়া ৫০.০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ১২ = ৪,৬৮৭/= টাকা

৮। ফারুক ৫০.০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ৬ = ২,৩৪৪/= টাকা

৯। হারুন ৫০.০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ৩ = ১,১৭২/= টাকা

১০। সাদিক ৫০,০০০/= ÷১২৮ = ৩৯০.৬২× ৩ = ১,১৭২/= টাকা

মোট = ৫০,০০০/= টাকা

৪৮. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনে নারীর অংশ কম কেন?

ইসলামী তামাদ্দুনে যে কোন একজন নারী কোন পুরুষের সহোদরা, কারো দুহিতা, কারো জননী, কারো সহধর্মিণী। অনুরূপভাবে একজন পুরুষও কোন মহিলার ভাই, কারো পুত্র, কারো পিতা অথবা কারো প্রিয়তম স্বামী। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সংবিধানে নর-নারীর মাঝে কোনো বাদানুবাদ নেই।

নারী পুরুষ তথা সকল সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আল্লাহ্। তিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনি কখনো কারো প্রতি কিঞ্চিত পরিমাণ পক্ষপাতিত্ব করেন না। উত্তরাধিকার বিধান তিনিই নাযিল করেছেন, আর মানবতার বিশ্বস্ত বন্ধু নবী মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে বিধান কার্যকর করেছেন। আল্লাহর বিধানে ঘোষণা এসেছে :

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ط نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا.

'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ রয়েছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ রয়েছে, তা কম হোক অথবা বেশি, এক নির্ধারিত অংশ।'[৫৬]

৫৬. সূরা আন নিসা : ৭

www.bjilibrary.com

আরো ঘোষণা এসেছে :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلَادِكُمْ ق لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ ج فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ج وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.

'তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই বিধান দিচ্ছেন : পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান হবে। যদি কন্যার সংখ্যা দু'-এর অধিক হয় তবে তাদেরকে পরিত্যক্ত (ষোল আনা) সম্পত্তির ২/৩ অংশ দিতে হবে। আর একজন মাত্র কন্যা হলে সে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ১/২ অংশ পাবে।[৫৭]

উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি আল কুরআনের বাণী। এর বিস্তারিত বিবরণ এসেছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসে। পরবর্তী মনীষীগণ এ মূল ধারার উপরই ছিলেন।

ইসলাম বিদ্বেষী পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ও বাহক আর তাদের অনুসারী কিছু সংখ্যক মুসলিম নামধারী ব্যক্তি নারীর সম-অধিকারের শ্লোগানের আড়ালে ইসলামকে তাদের আক্রমণের টার্গেট বানিয়েছে। মূলত ইসলামের বিধি-বিধানের ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইসলামের আলোর ছোঁয়া তাদের চোখে লাগেনি। তাদের অবস্থা আল কুরআনের ভাষায় :

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ ط وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ.

"মহান আল্লাহ তাদের মন ও শ্রবণ শক্তির উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টি শক্তির উপর আবরণ পড়েছে।"[৫৮]

আমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইসলামী ফিক্হ শাস্ত্রে সাধারণ নিয়মানুসারে নারী-পুরুষের মীরাস বণ্টনের ৩টি ধারা রয়েছে।

(১) নারী-পুরুষের অবস্থান অভিন্ন হবার পরও কখনো পুরুষ অংশীদার হয় না অথচ নারী অংশীদার হয়ে থাকে। যেমন :

(ক) মৃত ব্যক্তির নানা-নানী জীবিত থাকলে নানা উত্তরাধিকারী হবে না; কিন্তু নানী উত্তরাধিকারিণী হবে।

---

৫৭. সূরা আন নিসা : ১১

৫৮. সূরা বাকারা : ৭

www.bjilibrary.com

(খ) অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির দৌহিত্র (মেয়ের ঘরের ছেলে) অংশ পাবে না; কিন্তু পৌত্রী (ছেলের ঘরের মেয়ে) অংশ পাবে।

(২) নারী-পুরুষ কখনো সমান অংশীদার হয়। যথা : মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। আল কুরআনে ঘোষণা এসেছে :

وَاِنْ كَـانَ رَجُلٌ يُـوْرَثُ كَـلاَلَـةً اَوْ امْــرَاَةٌ وَلَـهُ اَخٌ اَوْ اُخْـتٌ فَـلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْـهُمَا السُّدُسُ ج فَـاِنْ كَـانُـوْا اَكْـثَـرَ مِنْ ذٰلِك فَـهُمْ شُـرَكَاءُ فِي الـثُّلُثِ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصٰى بِـهَا اَوْ دَيْـنٍ.

“কালালাহ্ অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী বৈপিত্রেয় এক ভাই বা বোন থাকলে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ হবে। আর একাধিক হলে, সকলে মিলে এক-তৃতীয়াংশে সমঅংশীদার হবে, যখন ওয়াসিয়াত পূরণ করা হবে ও ঋণ পরিশোধ করা হবে।[৫৯]

(৩) কখনো নারী পুরুষের অর্ধেক পাবে। যেমন : মৃত ব্যক্তির কন্যা বা বোন অর্ধেক পাবে, তাদের সাথে ভাই থাকলে। যেমনটি আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ" (এক ছেলের অংশ দুই মেয়ের সমান)।”

কথিত নারীবাদীরা এ বিষয়টিকেই টার্গেট বানিয়েছে। ‘এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান’ এ কথাটি গ্রহণের ব্যাপারে ওরা আপত্তি জানিয়েছে।

পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ “জারূদী” বলেন : “আরব্য নারী, প্রাগৈতিহাসিক যুগে উত্তরাধিকারিণী হতো না।[৬০] পরে ইসলাম এসে উত্তরাধিকারে তাকে পুরুষের অর্ধাংশ দিয়েছে। এরপর আমরা এখন আধুনিক তথা প্রগতির যুগে উপনীত হয়েছি, তাই নর-নারী সবাই সমান। কোন পার্থক্য ছাড়াই নারী-পুরুষের সমান অংশ আইন করে চালু করতে হবে।”

জারূদীর চাইতে আরো এক ধাপ এগিয়ে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় উজ্জীবিত প্রাচ্যের কিছু সংখ্যক কথিত মুসলিম তার সুরে সুর মিলিয়ে বলতে লাগলো : “ইসলামী বিধি-বিধান সর্বদা অপরিবর্তনীয় নয়, বরং প্রতিটি বিধি-বিধান প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে হতে হবে। আর ইসলামী আইন শাস্ত্রের নতুন নতুন গবেষণালব্ধ উদ্ভাবন পারিপার্শ্বিকতারই ফলাফল। তাই উত্তরাধিকারের ব্যাপারে

৫৯. সূরা আন নিসা : ১২

৬০. দেখুন : সাবরী আল আশূহ : আত-তাফকীর ‘ইনদা আইম্মাতিল মুসলিমীন।

www.bjilibrary.com

নারীর অংশ পুরুষের সমান নির্ধারণে আধুনিক গবেষণা বা ইজতিহাদ করতে বাধা কোথায়? তারা ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদদের অকাট্য প্রমাণভিত্তিক ভাষ্য (বা دليل قطعى), যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন করা যায় না– এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলতে চায় যে, প্রামাণ্য মূল ভাষ্য সবগুলোই যুগের চাহিদা এবং প্রগতির কাছে আনত থাকবে, বরং প্রতি যুগে শরীয়াহ্-এর মূল ভাষ্যও গবেষণা বা ইজতিহাদের কাছে অবনমিত থাকবে।

তাদের এ দাবীর পেছনে যুক্তি হলো : খালীফাহ্ 'উমার (রা) তাঁর শাসনামলে দুর্ভিক্ষের বছর আল কুরআনের আয়াত- 'اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا' "পুরুষ ও নারী চোরের হাত কেটে দাও"[৬১] বিধান মুলতবী ঘোষণা করেছিলেন। তেমনি সমাজের কল্যাণে যাকাতের مصارف বা ব্যয়ের খাত থেকে "اَلْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ" তথা 'যাদের চিত্তাকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের'– এ মূল ভাষ্যটি স্থগিত করেছেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা নারীকে পুরুষের সমান অংশ দেয়ার ব্যাপারে আল কুরআনের আয়াত স্থগিত রাখার মনোভাব ব্যক্ত করছে। তারা মনে করে এটা হবে সমাজের কল্যাণে একটি গবেষণা।

তারা মূলত ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ। তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, খালীফা 'উমার (রা) আল কুরআনের মূল ভাষ্যকে বাতিল করেননি, বরং প্রতিপাদ্য বিষয়টি অনুধাবন করেছেন এবং এর বাস্তবায়ন উপলব্ধি করেছেন মাত্র। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চুরির কারণে আরবের মাখযুম গোত্রের এক মহিলার হস্তচ্ছেদ যখন করেছিলেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট ছিল, মহিলাটি ক্ষুধা নিবারণ বা নিছক প্রয়োজনের তাকিদে চুরি করেনি বরং লোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে চুরি করেছে। এই কারণে 'উমার (রা) দুর্ভিক্ষের বছর কোন ক্ষুধার্তের হস্তচ্ছেদ কার্যকর করেননি। কেননা হতে পারে সে নিজ ক্ষুধা নিবারণের জন্য ক্ষুধার্ত অবস্থায় অপারগ হয়ে চুরি করেছে, এ কারণে তার হাত কিভাবে কাটা যেতে পারে?

বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি খালীফা 'উমার (রা) এর নিকট নিজ কর্মচারীর চুরির অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হলে তিনি তাকে এই বলে সতর্ক করে দেন যে, আমার ধারণা ভ্রান্ত না হলে বলতে পারি, তোমরা নিজেদের কর্মচারীদেরকে

৬১. সূরা আল বাকারা : ৩৮

www.bjilibrary.com

উপোস রাখ বলেই তারা চুরি করে। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার এ কর্মচারীর চুরির অভিযোগ আবারো আমার কাছে আসলে আমি বরং তোমার হাতই কেটে দেব।[৬২]

'উমার (রা) এর বিচক্ষণতা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শিক্ষার ফল। চুরির অপরাধে যে মহিলার হাত কাটা হয়েছিল, সে আরবের মাখযুম নামক সম্ভ্রান্ত গোত্রের সদস্যা ছিল। আরব সমাজে এ গোত্রের অবস্থান ছিল অনন্য সাধারণ। মাখযুম গোত্র কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচার জন্য উক্ত মহিলার ব্যাপারে সুপারিশ করার নিমিত্তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্নেহভাজন যায়িদকে (রা) অনুনয়-বিনয় করেছিল। তিনি সুপারিশ করলেন বটে, কিন্তু আদল ও ইনসাফের অনন্য দৃষ্টান্ত নবী মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়িদকে তিরস্কার করে বললেন : 'আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের ব্যাপারে তুমি নাক গলাতে এসেছো? আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি আমার কন্যা ফাতিমাও চুরির অপরাধে অপরাধী হতো, তাহলে আমি নিজে তার হাত কেটে দিতাম।[৬৩]

উপরোক্ত ঘটনার মাধ্যমে 'উমার (রা) চুরি সংক্রান্ত আয়াত-এর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সে কারণেই দুর্ভিক্ষের বছর চোরের হাত কাটার রীতি মুলতবী ঘোষণা করেছেন।

তেমনিভাবে যাকাত হল কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্তাকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারী ও মুসাফিরদের জন্য।[৬৪] এ আয়াতে 'যাদের চিত্তাকর্ষণ করা প্রয়োজন তাদের হক' উক্ত বিধান খালীফা 'উমার (রা) মুলতবী ঘোষণা করেছেন।

ইসলামের সূচনালগ্নে নও মুসলিমদের মন রক্ষা করার জন্য যাকাতের মাল দেয়া হতো। কারণ তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে বিশেষ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মাধ্যমে ইসলামকে শত্রুর চোখে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু 'উমার (রা) এর শাসনামলে ইসলাম পৃথিবীব্যাপী বিজয়ের আসনে সমাসীন হয়,

---

৬২. দেখুন : আল্লামা সাইয়েদ আস-সাফতী প্রণীত মুসলিম নারী, পৃ. ৩৩

৬৩. দেখুন : সহীহ আল বুখারী, আল-আম্বিয়া অধ্যায়, সহীহ মুসলিম, হুদূদ অধ্যায়, (باب قطع السارق الشريف وغيره)।

৬৪. সূরা আত্তাওবা : ৬০

www.bjilibrary.com

যার কারণে নও মুসলিমদের যাকাত প্রদানের মাধ্যমে চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজন ছিল না, বরং তারাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হতে ব্যাকুল ছিলো।

নও মুসলিমদের ব্যাপারে উক্ত হুকুম অবশ্যই কার্যকর আছে, যখন তাদের মন রক্ষা করার পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কিন্তু যখন সে রকম পরিস্থিতি থাকবে না, বরং তারাই ইসলামের আশ্রয়ে এসে নিজেদের ধন্য মনে করবে, তখন তাদেরকে যাকাতের অর্থ কেন দেয়া হবে? তাই 'উমার (রা) এর সিদ্ধান্ত উক্ত আয়াত এর হুকুম বহির্ভূত ছিলনা। বরং সময়োপযোগী তাঁর এ নির্ভুল সিদ্ধান্ত তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতারই প্রমাণ বহন করে।

তেমনিভাবে চুরির শাস্তি তাকেই দেয়া হবে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় নয়, বরং লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে চুরি করে। তাই 'উমার (রা) এর ব্যাপারে এই বলে সমালোচনা করার কোন অবকাশ নেই যে, তিনি আল কুরআনের অকাট্য ভাষ্য মুলতবী করেছেন। তিনি যা করেছিলেন তা বুঝে-শুনে ইসলামী হুকুমের পক্ষেই করেছিলেন। ইসলামী শরীয়ার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তাঁর মাধ্যমে শরীয়ার কোন হুকুমের বিলোপ সাধন করার কল্পনাও করা যায় না। বরং তিনি মহান আল্লাহকে অত্যধিক ভয় করতেন। তিনি প্রায়শই বলতেন : "আমি সে সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, যদি ফোরাত নদীর তীরে কোন উট ক্ষুধার কারণে মারা যায়, তাহলে আমার ভয় হয় যে, এ জন্যও আমাকে মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।"৬৫

উপরের আলোচনায় আমরা এ কথাটিই পরিষ্কারভাবে বলার চেষ্টা করেছি যে, সাধারণতঃ নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক। পিতার ওয়ারিস হিসেবে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে মেয়ে যেখানে ১ টাকা পাবে ছেলে পাবে সেখানে ২ টাকা। আল কুরআনের ভাষায় একথাটি এভাবে বলা হয়েছে : "للذكر مثل حظ الانثيين" "পুরুষের অংশ নারীর দ্বিগুণ"। মহান আল্লাহর এ বিধান কিয়ামাত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে। নারী আল্লাহর বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে সন্তুষ্টচিত্তে তার হিস্‌সা গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তাকে জান্নাত দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর এ আইনের সাথে যারা না-ফরমানী করবে আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন বলেও ঘোষণা করেছেন।

৬৫. দেখুন : ইবনুল আসীর, আলকামিল ফিততারীখ, ৩/৫৪

www.bjilibrary.com

মহান আল্লাহ্‌র এ বিধান অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত। এতে عدل ও ইনসাফ পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করা হয়েছে। ইসলামী তামাদ্দুনে পুরুষকে যে গুরু দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তা নারীকে দেয়া হয়নি বিধায় উত্তরাধিকারে যে অংশ পুরুষকে দেয়া হয়েছে তা নারীকে দেয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে মুসলিম মনীষীগণ অনেকগুলো যৌক্তিক কারণ তুলে ধরেছেন যেগুলোর প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে ইসলামের মীরাস বণ্টন নীতি যে কত সুন্দর, নিখুঁত, নিরপেক্ষ ও বাস্তবসম্মত তা সহজেই বুঝা যায়। আমরা সংক্ষিপ্তাকারে কিছু কারণ এখানে উল্লেখ করছি :

(১) অর্থ-সম্পদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের নানাবিধ চাহিদা ও প্রয়োজন মেটানো; এর জন্য অর্থ-সম্পদের কোন বিকল্প নেই, এটা অধুনা অর্থনীতিরও মূল কথা। নারীর অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন যেহেতু পুরুষের তুলনায় কম সেহেতু তার অংশ পুরুষের অংশের চেয়ে কম হওয়াই উচিত।

(২) ইসলামে নারীকে সাধারণত বৈষয়িক বিষয়ে মৌলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে (যেমন– খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যাপারে) দায়মুক্ত রাখা হয়েছে। নারীর যাবতীয় দায়িত্ব তার অভিভাবক অথবা স্বামীর উপর। সুতরাং তার হিস্যা কম হওয়াই শ্রেয়।

(৩) ইসলামের বিধান অনুযায়ী দেন মোহর বিবাহের জন্য অতীব জরুরী বিষয়। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তার ইজ্জত ও পদমর্যাদার সম্মানজনক স্বীকৃতিস্বরূপ মোহর আদায় করতে হয়। মোহরানার অর্থ স্ত্রীর জন্য এক বাড়তি সঞ্চয়। স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী মোহরানার অংক বিশাল আকারেরও হতে পারে, যার এক পয়সাও স্ত্রীকে সংসারের কাজে খরচ করতে হয় না। একদিকে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার, একই সংগে সন্তানাদির ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা এমনকি স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের মেহমানদারীর দায়-দায়িত্বও স্বামীর স্কন্ধে ন্যস্ত। এর বাইরে আর্থ-সামাজিক অনেক ধরনের দায়-দায়িত্ব তো আছেই। সুতরাং অর্থ-সম্পদের যতটা প্রয়োজন পুরুষের ততটা নারীর নয়। উত্তরাধিকার বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর দ্বিগুণ অংশ দেয়ার মধ্যে এসব বিষয়ই বিবেচিত হয়েছে।

(৪) একজন নারী তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তার ভাই'র তুলনায় অর্ধেক পেলেও সে তার মাতা, দাদা, স্বামী ও বৈপিত্রেয় ভাই অবস্থা বিশেষে অন্যান্য আত্মীয় থেকেও মীরাস লাভ করে থাকে যা একত্রে যোগ করলে ভাইয়ের তুলনায় কম নয় বরং বেশি হয়ে যায়।

(৫) আল্লামা শায়খ 'আলী আস সাবুনী-এর একটি উপমা দিয়ে এ প্রসঙ্গে

www.bjilibrary.com

আলোচনা শেষ করতে চাই। বাহ্যত নারীর মীরাস পুরুষের তুলনায় কম মনে হয়। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে মূলত বিষয়টি এমন নয়। নারীকে ইসলাম ঠকায়নি। মধ্যপ্রাচ্যের খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ 'আলী আস সাবুনী তাঁর "المواريث فى الشريعة الاسلامية" গ্রন্থে একটি সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করে লিখেছেন যে, "মনে করুন, কোন ব্যক্তি মৃত্যুকালে তিন হাজার টাকা এবং এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যায়। ইসলামী মীরাস বণ্টন নীতি মুতাবিক ছেলে পায় দু'হাজার টাকা এবং মেয়ে পায় এক হাজার টাকা। এহেন অবস্থায় ছেলেটি বিবাহ করতে গিয়ে তার স্ত্রীকে দু'হাজার টাকা মোহর দিল। এখন সে কপর্দকহীন। অতপর মেয়েটির বিবাহ হল। সে তার স্বামীর নিকট থেকে দু'হাজার টাকা মোহর হিসেবে লাভ করল। এমতাবস্থায় দেখা যাচ্ছে মেয়েটি তার পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এক হাজার টাকা লাভ করেও এখন তিন হাজার টাকার মালিক। অন্যদিকে তার ভাই পিতার সম্পদ থেকে বোনের দ্বিগুণ পেলেও এখন কপর্দকশূন্য। এরপরও তাকে সংসারের যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করতে হচ্ছে। অথচ তার বোন তিন হাজার টাকার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তার উপর কোন প্রকার অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব বর্তায় না।"

এবার ভেবে দেখুন! বাহ্যিকভাবে ছেলের প্রাপ্ত সম্পদ দ্বিগুণ আর মেয়ের সম্পদ একগুণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তদ্রূপ নয়।

৪৯. নারী ও পুরুষের উপর প্রাকৃতিক দায়িত্ব

নারী ও পুরুষকে প্রকৃতি সমান দায়িত্ব দেয়নি। পুরুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে নারীর তুলনায় অনেক বেশি দায়-দায়িত্ব। এগুলোর অধিকাংশই অর্থের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে নারীর উপর অর্থনৈতিক কোন প্রকার দায়-দায়িত্ব চাপানো হয়নি। এমতাবস্থায় নারীকে পুরুষের সমান আর্থিক যোগান দেয়া কি সুবিচার? নাকি পুরুষকে তার দায়িত্ব পালন করার সুযোগ দেয়াটাই হবে সুবিচার? এর জবাবে অবশ্যই বলতে হবে যে, সুবিচার ও মধ্যমপন্থা সেটাই যা ইসলাম মুসলিম উম্মাহকে উপহার দিয়েছে। এটি বিজ্ঞানসম্মত ও প্রাকৃতিক এবং মানবীয় প্রয়োজনের সম্পূর্ণ উপযোগী।

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে নারী ও পুরুষ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। আর উভয়ের শরীর ও অবয়ব উক্ত দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে তৈরী করেছেন। সৃষ্টির

www.bjilibrary.com

বৈশিষ্ট্য হল নর দেহ গর্ভ দান করবে আর নারী দেহ গর্ভধারণ করবে। সুতরাং গর্ভধারণের কষ্ট ও প্রসব কষ্ট নারীকেই ভোগ করতে হবে। সমঅধিকার দাবিতে আন্দোলন করে এ নিয়ম ভাগাভাগি করে নেয়া যাবে না।

ইসলাম নারী ও পুরুষকে সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার দেয়নি, বরং যার যার উপযোগী ন্যায়ভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত ন্যায্য অধিকারের গ্যারান্টি দিয়েছে। সকল ক্ষেত্রে সমতা যেমন অযৌক্তিক তেমন ন্যায্যতার পরিপন্থী।

"الا له الخلق والأمر।" 'সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং হুকুমও তাঁরই।' অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন আর আইন-কানুনও তিনিই নাযিল করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টি তাঁরই আইন মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। একমাত্র তিনি ছাড়া যেহেতু অন্য কেউ স্রষ্টা হওয়ার যোগ্য নয়, সেহেতু অন্য কেউ আইন তৈরী করারও অধিকার রাখে না। বস্তুবাদীদের সৃষ্ট ভারসাম্যহীন চরম বাড়াবাড়ির বর্তমান অবস্থায় একটি মাত্র তামাদ্দুনিক ব্যবস্থা এমন আছে, যার মধ্যে পরিপূর্ণ ন্যায়নীতি ও ভারসাম্য পরিদৃষ্ট হয়, যার মধ্যে মানব জীবনের এক একটি দিকের প্রতি, এমনকি অপ্রকাশ্য দিকের প্রতিও দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মানব জীবনের সার্বিক চাহিদা পূরণার্থে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ন্যায়নীতি, এই ভারসাম্য, এই সামঞ্জস্য বিধান এতই পূর্ণাংগ যে, কোন মানুষের পক্ষে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-সাধনা দ্বারা এটি তৈরী করা সম্ভব নয়। মানুষের তৈরী আইন– অথচ তার মধ্যে কোথাও ঘাটতি দেখা যাবে না, একমুখিতা পরিদৃষ্ট হবে না, এমনটি সম্পূর্ণ অসম্ভব। আইন তৈরী তো দূরের কথা, আসল কথা এই যে, সাধারণ লোক তো এই ন্যায়নিষ্ঠ, ভারসাম্য ও চরম বিজ্ঞানসম্মত বিধানের তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধি করতে পারবে না– যতক্ষণ পর্যন্ত সে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী না হয় এবং তৎসম্পর্কে বছরের পর বছর ধরে গবেষণা না করে। এ সুন্দরতম বিধানের নিজস্ব সৌন্দর্য সাক্ষ্য দেয় যে, এ নিখুঁত বিধান তিনিই নাযিল করেছেন, যিনি এ বিশাল নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী।

قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ.

'আপনি বলুন, হে আল্লাহ, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা দৃশ্য ও অদৃশ্যের

www.bjilibrary.com

জ্ঞানের অধিকারী, আপনিই সেসব বিষয়ে আপনার বান্দাহ্দের মাঝে সঠিক ফায়সালা দিচ্ছেন, যেসব বিষয় নিয়ে ওরা মতভেদ করে আসছিলো।'[৬৬]

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوتُ وَالاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ.

'সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হত। তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত। পক্ষান্তরে আমি তাদেরকে দান করেছি উপদেশ, কিন্তু তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।'[৬৭]

৫০. ওয়ারিস হওয়া সত্ত্বেও মীরাস থেকে কারা বঞ্চিত হবে?

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, মীরাস লাভের মূল ভিত্তি হচ্ছে জন্মগত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক। মৃত ব্যক্তির সাথে উক্ত সম্পর্ক থাকলেই ওয়ারিস হওয়া যায় এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করা যায়; কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণিত কারণসমূহের কোন একটিও কারো মধ্যে পাওয়া গেলে সে মৃত ব্যক্তির যত নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন কিছুতেই মীরাস পাবে না। বর্তমানে এরূপ কারণ ৩টি :[৬৮]

(১) হত্যা :

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি মুরিসকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে সে (হত্যাকারী) নিহত ব্যক্তির (মুরিসের) পক্ষ থেকে মীরাস পাবে না। সম্পূর্ণভাবে মীরাস থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে। এ ব্যাপারে নবী মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন :

ليس للقاتل شيئٌ وان لم يكن له وارثٌ فوارثه اقرب اناس اليه.

'হত্যাকারী কোন কিছুই পাবে না। যদি তার ওয়ারিস না থাকে, তবে অন্যান্য লোকদের মধ্যে যে তার নিকটাত্মীয় সেই তার ওয়ারিস হবে।'[৬৯]

---

৬৬. সূরা আয্ যুমার : ৪৬

৬৭. সূরা আল মুমিনুন : ৭১

৬৮. ফারাইয গ্রন্থাদিতে ৪টি কারণ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি হচ্ছে 'الرق' অর্থাৎ গোলামী। বর্তমানে ইসলামে গোলামী প্রথা নেই বিধায় এটা বাদ দেয়া হয়েছে।

৬৯. সুনান আবূ দাঊদ।

www.bjilibrary.com

(২) রাষ্ট্র ভিন্ন হওয়া :

মূলত এ কারণটি শুধু কাফিরদের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ দারুল হরবে বসবাসকারী কোন অমুসলিম এবং দারুল ইসলামে বসবাসকারী কোন অমুসলিম পরস্পরের মীরাস পাবে না। এছাড়া মুসলিম রাষ্ট্রের কোন মুসলিম মারা গেলে অমুসলিম রাষ্ট্রে তার মুসলিম আত্মীয় উত্তরাধিকারী হবে।[৭০]

(৩) দীন ভিন্ন হওয়া :

অর্থাৎ মুরিস এবং ওয়ারিস পরস্পর একই দীনের অনুসারী না হলে একে অপরের মীরাস পাবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন :

لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم.

'মুসলিম কাফিরের ওয়ারিস হয় না এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হয় না।'[৭১]

৫১. মুরতাদের মীরাস প্রসঙ্গ

স্বেচ্ছায় ইসলাম ত্যাগকারীকে মুরতাদ বলা হয়। (ارتداد। মানে হচ্ছে apostasy from Islam)। মুরতাদ ব্যক্তি কাফিরদের মধ্যে শামিল। সে তার মুসলিম আত্মীয় থেকে মীরাস পাবে না। অবশ্য তার সম্পত্তিতে মুসলিম আত্মীয় উত্তরাধিকার লাভ করার বিষয়টি সম্পর্কে মুসলিম মনীষীদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্য পাওয়া যায়।

মুরতাদ ব্যক্তির সম্পদের ২ অবস্থা হতে পারে :

(ক) তার মুসলিম থাকা অবস্থায় উপার্জিত সম্পদ।

(খ) ইসলাম ত্যাগের পর উপার্জিত সম্পদ।

ইসলাম ত্যাগের পর তার উপার্জিত সম্পদ হচ্ছে কাফিরের সম্পদ। সুতরাং হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তার মুসলিম আত্মীয় এতে মীরাস পাবে না। তবে সে মুসলিম থাকা অবস্থায় যতটুকু সম্পদের মালিক ছিল ততটুকু মুসলিম আত্মীয়রা বণ্টন করে নেবে। মুরতাদ যদি পুরুষ লোক হয়, তবেই শুধু এ হুকুম। কিন্তু মুরতাদ যদি মহিলা হয় তবে সে ক্ষেত্রে পার্থক্য হবে না।

---

৭০. উক্ত কারণটি ফারাইয গ্রন্থে উল্লেখ করলেও তা নিষ্প্রয়োজন। কেননা আমাদের আলোচ্য বিষয় মুসলিমদের মীরাস। ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী মুসলিম পরস্পরের উত্তরাধিকারী হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই।

৭১. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম।

www.bjilibrary.com

বরং তার উভয় অবস্থার সম্পদের মধ্যে মুসলিম আত্মীয়দের উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে।[৭২]

৫২. উপসংহার

ইসলামী উত্তরাধিকার আইন বিষয়ক উক্ত প্রবন্ধটি থেকে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্‌কে অত্যন্ত সুন্দর, বিজ্ঞান সম্মত, ভারসাম্যপূর্ণ ও ইনসাফভিত্তিক উত্তরাধিকার আইন উপহার দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোন সভ্যতা অথবা মানব রচিত কোন মতবাদ এ ধরনের ভারসাম্যপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত মীরাসী আইন কোন জতিকে উপহার দিতে পারেনি।

মৃত ব্যক্তির সাথে জন্মগত সম্পর্ক ও নিকটাত্মীয়তাকে উত্তরাধিকার লাভের মূল ভিত্তি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। এতে উত্তরাধিকার নিয়ে যেকোন তর্ক ও প্রশ্নের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ইসলাম তার এ মজবুত ও নিখুঁত মীরাসী আইনকে সময় ও কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে চিরস্থায়ী বিধান হিসেবে ঘোষণা করে দিয়েছে। এতে নূতন কোন চিন্তা, গবেষণা, পরিবর্তন ও পরিমার্জনের যাবতীয় ছিদ্রপথ এ আইনের ব্যাপারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক দায়িত্বভার ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ আইনে নারীর অংশ পুরুষ থেকে কম রাখা হয়েছে। এটাই সু-বিচারের দাবী।

মীরাসী আইনের পাশাপাশি وصية এবং هبة-এর বিধান ও ইসলাম সব সময়ের জন্যে উন্মুক্ত রেখে দিয়েছে। দূর সম্পর্কের যে সকল আত্মীয়-স্বজন সরাসরি মীরাস পায় না, যাদের মধ্যে পুত্রের বর্তমানে নাতীও রয়েছে– মুরিস সে সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্যে পুরো সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ ($\frac{১}{৩}$) পর্যন্ত ওয়াছিয়াত করে দিতে পারেন।

ইসলাম মুসলিম উম্মাহ্‌কে মীরাস বণ্টনের পাশাপাশি এ হিদায়াতও দিয়েছে যে, মীরাস বণ্টনের সময় যদি কোন অসহায় আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীন এসে হাজির হয়, তাহলে তাদেরকেও যেন কিছু দান করা হয় এবং সর্বোপরি তাদের সাথে সদাচরণ করা হয়।

শুধু তাই নয়, দুস্থ মানবতার কল্যাণের জন্যে ইসলাম যাকাত, উশর ইত্যাদি

৭২. আহকামুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ইলাউস সুনান ১৮তম খণ্ড ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মাসায়েল, ই.ফা.বা প্রকাশনা, ২৩৫৪/১, পৃ. ৫২

www.bjilibrary.com

বিত্তবানদের উপর আবশ্যক করেছে। মানবতার বিশ্বস্ত বন্ধু নবী মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে 'তোমাদের কেউ পেটভরে পানাহার করবে আর তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত কাটাবে- এমতাবস্থায় সে (প্রকৃত অর্থে) মুমিন হতে পারে না'।[৭৩] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন, 'হযরত জিব্রাঈল (আ) প্রতিবেশী সম্পর্কে আমাকে অনবরত ওয়াছিয়াত করতে লাগলেন যে, আমি আশঙ্কা করতে লাগলাম, অচিরেই হয়তো প্রতিবেশীর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধান এসে যেতে পারে'।[৭৪]

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁরই দেয়া হিদায়াতের উপর 'আমল করার তাওফীক দান করুন! আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد واله وأصحابه وبارك وسلم.

সমাপ্ত

---

৭৩. আল বাইহাকী شعب الإيمان অধ্যায়।

৭৪. সহীহ আল বুখারী, সহীহ মুসলিম---।

www.bjilibrary.com

ইসলামের সাক্ষ্য আইন

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন

www.bjilibrary.com

মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন কর্তৃক প্রণীত "ইসলামের সাক্ষ্য আইন" শীর্ষক গবেষণাপত্রটি প্রথমে একত্রিশ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নিকট প্রেরণ করা হয়। অতপর এটি নভেম্বর ২৭, ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত 'স্টাডি সেশনে' সামষ্টিক পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপিত হয়। উক্ত স্টাডি সেশনে' মূল্যবান পরামর্শ সম্বলিত বক্তব্য পেশ করেন–

মাওলানা মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল মা'বুদ, ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ, ড. হাসান মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন, অধ্যাপক এ. এন. এম. রাফিকুর রহমান, অধ্যক্ষ এ. কিউ. এম. আবদুল হাকীম, মুফতী মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ খান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মাদ মতিউল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মাদ আবদুল কাদির, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, মাওলানা মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান আল মাদানী, ড. নজরুল ইসলাম খান, ড. আ. জ. ম. কুত্বুল ইসলাম নু'মানী, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, জনাব যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক, জনাব মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম ও জনাব শফিউল আলম ভূঁইয়া।

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইসলামের সাক্ষ্য আইন

১. ভূমিকা

আইন এমন একটি অপরিহার্য বিষয়, যার দ্বারা মানব সমাজকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হয়। এর মাধ্যমেই সমাজের ভারসাম্য রক্ষা করা হয় এবং যুল্ম-অত্যাচারের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয় ও সবার অধিকার সংরক্ষিত হয়। পৃথিবীতে প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব আইন রয়েছে।

একটি জাতির আইন তাদের চিন্তাধারা ও অনুভূতির দর্পণস্বরূপ। জাতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে আইনের একটি সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেক আইনের মধ্যেই জাতির নৈতিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার একটি প্রতিবিম্ব বর্তমান থাকে। জাতির মেজাজ, স্বভাব-প্রকৃতির বিভিন্নতা আইনের পরতে পরতে অনিবার্যভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। একটি আইনের ভিত্তি যদিওবা ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি এর তুলনায় হাজারো আইনের ভিত্তি হচ্ছে শাসক ও আইন প্রণেতাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। কিন্তু ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জনকল্যাণমূলক জীবন ব্যবস্থা হওয়ায় মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধানও দেয়া হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ও যৌক্তিকভাবে। তাই ইসলামী আইনের মধ্যে এমন একটি আধ্যাত্মিক উপাদান রয়েছে যা মানব রচিত আইনে নেই। ইসলামের প্রতিটি আইনই ইসলামী শিক্ষার কোনো না কোনোটির ওপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ভরশীল। মুসলিমদের ঈমান আকীদার সাথে ইসলামী আইনের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

মূল আইনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম অনুষঙ্গ আইন হচ্ছে সাক্ষ্য আইন। কারণ যে কোনো ধরনের বিচার কার্যে সাক্ষ্য একটি অপরিহার্য উপাদান। ন্যায় বিচারের জন্য সাক্ষ্য প্রমাণ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মূল আইনে বিচার প্রার্থীকে বিচার চাইবার অধিকার দিয়ে থাকে, কিন্তু বিচার কার্যে পদ্ধতিগত আইন অনুসরণ করতে হয়। পদ্ধতিগত বা কার্যবিধি আইনের বিধানকে প্রয়োগের জন্য 'সাক্ষ্য

www.bjilibrary.com

আইন' আলোকবর্তিকা-স্বরূপ। সেই কারণে সাক্ষ্য আইন পদ্ধতিগত আইন হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। মামলার পক্ষবৃন্দের বিরোধের গর্ভে নিহিত সত্য উদ্ধারকল্পে সাক্ষ্য আইনের বিধান প্রয়োগ করা হয়। আমরা আগেই বলেছি ইসলামী আইন স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, তাই ইসলামের 'সাক্ষ্য আইন'ও স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবী রাখে। ইসলামের সাক্ষ্য আইন সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।[১]

২. সাক্ষ্যের সংজ্ঞা

প্রচলিত আইনে সাক্ষ্য কী এই মর্মে কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। তবে বাসুদেব গাঙ্গুলীর 'সাক্ষ্য আইন'-নামক গ্রন্থে সাক্ষ্যের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে- 'যা দ্বারা বিচার্য বিষয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রমাণের প্রয়াস পায়- তাকে সাক্ষ্য বলে'।[২]

সাক্ষ্য-এর আরবী বেশ ক'টি প্রতিশব্দ রয়েছে, যেমন- শাহাদাহ্ (شهادة) অর্থ-উপস্থিতি, নির্ভরযোগ্য সংবাদ। আল মুশাহাদা (المشاهد), অর্থ-চাক্ষুষ দেখা, কেননা সাক্ষী সেই বিষয়েই সাধারণত সাক্ষ্য দেন, যা তিনি চাক্ষুষ দেখে থাকেন। শাহীদা (شهد), অর্থ- জানা কিংবা জানানো।[৩] ইসলামী আইনের পরিভাষায় শাহাদাহ্ (সাক্ষ্য) বলা হয়-

اِخْبَارُ صَادِقٍ لاِثْبَاتِ حَقٍّ بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ فِىْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ.

'অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য 'সাক্ষ্য' শব্দের দ্বারা আদালতে যথার্থ সংবাদ পরিবেশনকে।'[৪]

সাক্ষ্য আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জুরজানী (মৃ-৯৭৩) বলেছেন-

---

১. ভূমিকার বক্তব্য বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন- ইসলামী আইন বনাম মানব রচিত আইন, আবদুল কাদের আওদাহ্, পৃ. ৯৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত। সাক্ষ্য আইন, খোশরোজ কিতাব মহল, পৃ. ০৫। সাক্ষ্য আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী, খোশরোজ কিতাব মহল, পৃ. ৭।

২. সাক্ষ্য আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী, পৃ-১১।

৩. আল মাওরিদ, আরবী ইংরেজী অভিধান, ড. রুহী বালাবাকী।

৪. ফতহুল কাদীর, ৬/২। আশ শারহুল কাবীর, ৪/১৬৪। মুগনী আল মুহতাজ ৪/৪২৬। দুররুল মুখতার, ৪/৩৮৫। আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৬/৫৫৬।

www.bjilibrary.com

الشهادة وهى فى الشريعة إخبار عن عيان بلفظ الشهادة فى مجلس القاضى بحق للغير على آخر فالاخبارات ثلاثة اما بحق للغير على آخر وهو الشهادة أو بحق للمخبر على آخر وهو الدعوى أو بالعكس وهو الإقرار۔

ইসলামী শরীআতে সাক্ষ্য বলতে বুঝায় বিচারকের সামনে অন্য লোকের জন্য (চাই তিনি বাদী বা বিবাদী যিনিই হোন না কেন) সত্য ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা। সাক্ষ্য তিন প্রকার। অপরের জন্য সত্য ঘটনার বিবরণ তুলে ধরার নাম সাক্ষ্য (শাহাদাহ্)। আর সত্যের সংবাদ কাউকে জানানোর নাম দাওয়াত। পক্ষান্তরে সেই সত্য বিষয় নিজে গ্রহণ করার নাম স্বীকারোক্তি।[৫]

৩. ইসলামী আইনে সাক্ষ্যের গুরুত্ব

ইসলামী আইনে সাক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন–

وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا.

'সাক্ষীগণকে (সাক্ষ্য দেবার জন্য) ডাকা হলে তারা যেন (সাক্ষ্য দিতে) অস্বীকার না করে।'[৬]

وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

'আল্লাহ্র (সন্তোষ লাভের) জন্য তোমরা সাক্ষ্য প্রদান কর।'[৭]

وَلاَ تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ.

'তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে তার অন্তর অপরাধী।'[৮]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِىْ يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهٖ قَبْلَ اَنْ يَسْأَلَهَا.

---

৫. কিতাবুত তা'রিফাত- আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জুরজানী, পৃ-১৪১-১৪২।

৬. সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৮২।

৭. সূরা আত তালাক, আয়াত-০২।

৮. সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৮৩।

www.bjilibrary.com

'আমি কি তোমাদেরকে বলবো না, উত্তম সাক্ষ্যদানকারী কারা? বলার আগেই যে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসে সেই উত্তম সাক্ষ্যদানকারী।'[৯]

যে কোনো ধরনের সাক্ষ্য হোক না কেন তা চেপে যাওয়া গুনাহ্। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَه مِنَ اللّٰهِ.

'যার কাছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্য বর্তমান রয়েছে সে যদি তা গোপন রাখে তবে তার চেয়ে বড়ো যালিম আর কে হতে পারে?'[১০]

বিচারাধীন মামলা সম্পর্কে যিনি পূর্বাপর অবহিত তার ওপর সাক্ষ্য দেয়া ফরয, যদি তাকে সাক্ষ্য দেয়ার আহ্বান করা হয়। কারণ এতে অন্যের অধিকার সংরক্ষিত হয়। আহ্বান না করা হলে সাক্ষ্য দেয়া উত্তম।[১১]

ফকীহ্গণের মতে চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে দুটো ক্ষেত্রে চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দেয়া উত্তম।

এক. কোনো ব্যক্তির মোকদ্দমায় সাক্ষীর প্রয়োজন। কিন্তু ঘটনাটি সম্পর্কে এমন এক ব্যক্তি পূর্ণ অবহিত যার সম্পর্কে বাদী বা বিবাদী আদৌ জ্ঞাত নন। এমন অবস্থায় না চাইতেই সাক্ষ্য দেয়া উত্তম।

দুই. হক্কুল্লাহ্র বিষয়ে যেমন যাকাত, চাঁদ দেখা ইত্যাদি বিষয়ে চাওয়ার আগে প্রশাসনের কাছে সাক্ষ্য দান উত্তম।[১২]

ইসলামে বিচারের সাথে সাক্ষ্য যে কত ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হাশরের ময়দানে আল্লাহ্র আদালতের বিচার। আল্লাহ্ যেখানে আলিমুল গাইব, (গোপন বিষয়ে অবহিত), সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, বিচারকদের বিচারক (আহকামুল হাকিমীন) তিনিও সেদিন বিচারে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ করবেন। অবশ্য তা এজন্য নয় যে, আল্লাহ্ সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিশ্চিত হবেন, বরং তা গ্রহণ করবেন এজন্য যাতে অভিযুক্ত কেউ তাকে দোষারোপ করতে না পারে। সেদিন মানুষের হাত, পা, চামড়া ও বিভিন্ন জড় পদার্থ মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। মোটকথা সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া বিচারের কথা ইসলামে কল্পনাও করা যায় না।

---

৯. সহীহ্ মুসলিম।

১০. সূরা আল বাকারা, আয়াত-১৪০।

১১. ফিকহুল সুন্নাহ, সাইয়েদ সাবেক, অনুচ্ছেদ-সাক্ষ্য।

১২. হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত।

www.bjilibrary.com

৪. সাক্ষ্যের প্রকার

ইসলামী আইনে সাক্ষ্য চার প্রকার। (১) ইতিবাচক সাক্ষ্য (شَهَادَةُ إِثْبَاتٌ)। (২) মিথ্যা সাক্ষ্য (شَهَادَةُ زُوْرٌ)। (৩) পরোক্ষ সাক্ষ্য (شَهَادَةُ سَمَاعٍ مِنَ الْغَيْرِ)। (৪) নেতিবাচক সাক্ষ্য (شَهَادَةُ نَفِيٌّ)।

(১) ইতিবাচক সাক্ষ্য : ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে আদালতে যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তাকে ইতিবাচক সাক্ষ্য বলে। ইতিবাচক সাক্ষ্য বাদীর অনুকূলে যেতে পারে, আবার বিবাদীর পক্ষেও যেতে পারে।

(২) মিথ্যা সাক্ষ্য (হদ্ বহির্ভূত বিষয়ে) :

মিথ্যা সাক্ষ্যদান মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা সাক্ষ্যদানের গুনাহ্ শিরকের পর্যায়ের গুনাহ্। কারণ এর দ্বারা নির্দোষ ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করেন কিংবা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন অথবা প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত হন। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে বলে প্রমাণিত হলে কিংবা স্বীকারোক্তি করলে আদালত তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। হাদীসে এসেছে–

'একবার রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ফজরের নামায পড়ালেন। নামায হতে অবসর হয়ে ওঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন– 'মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে অপরাধের দিক থেকে আল্লাহ্র সাথে শিরকের সমপর্যায় গণ্য করা হয়েছে।' একথা তিনি তিনবার বললেন। তারপর তিনি মহান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করলেন। (অর্থ) 'সুতরাং তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং মিথ্যাভাষণ থেকে বেঁচে থাকো।'[১৩] (সূরা আল হজ্ : ৩০)

উমার (রা) মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে তা'যীর এর শাস্তি প্রদান করেছেন। মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাকে পেছন দিকে মুখ করে সওয়ারীর ওপর বসিয়ে মুখে কালি মাখিয়ে ঘুরিয়েছেন। যেহেতু মিথ্যুক কিয়ামাতের দিন কালো চেহারা নিয়ে ওঠবে সেজন্য

---

১৩. হাদীসটির আরবী টেক্সট নিম্নরূপ–

عَنْ خُرَيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ. (مسلم، ابو داود، ترمذى)

www.bjilibrary.com

উমার (রা) তার চেহারায় কালি মাখিয়ে দিয়েছেন। আর যেহেতু সে কথা পরিবর্তন করে তাই তাকে পেছন ফিরিয়ে উল্টা দিকে বসিয়েছেন।[১৪]

একবার উমার (রা) এর কাছে এক মিথ্যা সাক্ষীকে হাজির করা হলো। তিনি নির্দেশ দিলেন, 'তার মুখে কালি লেপে দাও, পাগড়ি গলায় পেঁচিয়ে দাও এবং তার গোত্রে নিয়ে তাকে ঘুরাও এবং বলো, এ মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী এর সাক্ষ্য তোমরা আর গ্রহণ করো না।'[১৫]

ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে আসর নামাযের পর বাজারের মধ্যে ঘুরাতে হবে। সেই সাথে ঘোষণাকারী বলবে, এই ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে। হে লোক সকল, মিথ্যা সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকো। কিন্তু তাকে তা'যীর এর আওতায় শাস্তিস্বরূপ মারপিট করা যাবে না এবং জেলহাজতেও দেয়া যাবে না। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্যদান হতে বিরত রাখার জন্য জনসাধারণকে সতর্ক করা।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী বেত্রাঘাতের শাস্তিও ভোগ করবে এবং হাজতবাসের শাস্তিও ভোগ করবে যতক্ষণ সে তাওবা না করবে।[১৬] শাফিঈ মাযহাবের ইমামগণের অভিমতও প্রায় অনুরূপ। তাদের মতে বেত্রাঘাত, হাজতবাস, তিরস্কার, জনতার সামনে অপমান ইত্যাদি যে ধরনের শাস্তি বিচারক উপযুক্ত বিবেচনা করবেন মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারীকে সেই ধরনের শাস্তি প্রদান করবেন। মালিকী ও হাম্বলী ফকীহ্গণ মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানকারীর জন্য এক সাথে তিনটি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন– বেত্রাঘাত, জনসাধারণের সামনে ঘুরানো বা প্রচার এবং হাজতবাস।[১৭]

হদ্ সংক্রান্ত বিষয়ে সাক্ষ্য এড়িয়ে যাওয়া

হদ্-এর আওতাভুক্ত যেসব বিষয় সরাসরি আল্লাহ্র অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট, যেখানে বান্দার অধিকারের সংশ্লিষ্টতা নেই, সে ক্ষেত্রে হদ সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকার পরও ব্যক্তি ইচ্ছে করলে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে তা গোপন রাখার অনুমতিও রয়েছে। যেমন চারজন লোক কোনো

১৪. আসসিয়াসাত আশ্ শরীআহ্– ইবনু তাইমিয়াহ্, পৃ. ৬২। তাফসীর কুরতুবী, ৪/৩১২। আত তাশরীঈ আল জিনায়ী, আবদুল কাদের আওদাহ, ১/৭০৩।

১৫. সুনানু আল বাইহাকী, ১০/১৬৬। আল মুওয়াত্তা, ২/৭২০। আল মুহাল্লা, ৯/৩৯৪।

১৬. আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৮২।

১৭. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

নারী পুরুষকে ব্যভিচাররত দেখলেন, এমতাবস্থায় তারা ইচ্ছে করলে ঘটনা চেপে যেতে পারেন। হাদীসে বলা হয়েছে– 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন মুসলিমের ওপর হদ প্রয়োগ থেকে যথাসাধ্য বিরত থাকো। যদি তার অব্যাহতির সামান্য পরিমাণ উপায়ও বেরিয়ে আসে, তাকে ছেড়ে দাও। কারণ শাসকের ভুল করে শাস্তি দেয়ার চেয়ে ভুল করে ক্ষমা করে দেয়া অনেক ভালো।'[১৮]

মায়ায আসলামী (রা) এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে তাকে বলেছিলেন– 'তুমি যদি ঘটনাটি তোমার পরিধেয় বস্ত্র দিয়ে লুকিয়ে রাখতে, সেটি হতো তোমার জন্য উত্তম।'[১৯] একথা বলার পরও তিনি যাতে শাস্তির আওতায় না পড়েন সেজন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কয়েকবার পাশ কাটানোর চেষ্টা করেন।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোনো বান্দার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখেন।[২০]

(৩) পরোক্ষ সাক্ষ্য :

কোনো ব্যক্তি সংগত ওজরবশত, যেমন রোগের কারণে, বিদেশে অবস্থানের কারণে বা অনুরূপ কোনো কারণে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দিতে না পারলে

---

১৮. হাদীসের আরবী টেক্সট নিম্নরূপ–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَااسْتَطَعْتُمْ فَاِنْ كَانَ لَه مَخْرَجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَه فَاِنَّ الاِمَامَ يُخْطِئُ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْطِئُ فِي الْعُقُوْبَةِ. (ترمذى)

১৯. আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ–

لَوْ سَتَرْتَه بِثَوْبِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ ـ (سنن ابى داود)

২০. হাদীসের আরবী ভাষ্য নিম্নরূপ –

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ. (صحيح البخارى)

www.bjilibrary.com

তিনি তার বক্তব্য অন্য কারও কাছে বলে সেই বক্তব্য আদালতে পেশ করার জন্য পরোক্ষ সাক্ষী নিয়োগ করতে পারেন। একজন মূল সাক্ষীর পরিবর্তে অবশ্যই পরোক্ষ সাক্ষী দু'জন হতে হবে। এর কম হলে পরোক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

একজন মূল সাক্ষী যে দু'জনকে পরোক্ষ সাক্ষী নিয়োগ করবেন, অপর মূল সাক্ষীও স্বতন্ত্রভাবে সেই দু'জনকে পরোক্ষ সাক্ষী নিয়োগ করতে পারবেন।

সাধারণত দু'জন সাক্ষীর কমে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রদানও একটি অধিকার। পরোক্ষ সাক্ষীদ্বয় তাদের নিয়োগকর্তার এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

মহিলারাও পরোক্ষ সাক্ষী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

হদ ও কিসাস ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে পরোক্ষ সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। হদ ও কিসাসের বেলায় মূল সাক্ষীকেই আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। সমস্যা থাকলে তা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির মধ্যে যেসব শর্ত বর্তমান থাকলে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য বিবেচিত হয় পরোক্ষ সাক্ষীর জন্যও সেসব শর্ত প্রযোজ্য হবে।

কোনো ব্যক্তিকে পরোক্ষ সাক্ষী নিয়োগ করলে কিংবা আদালত কর্তৃক অনুমোদিত হলেই কেবল তিনি পরোক্ষ সাক্ষী হিসেবে গণ্য হবেন। অন্যথায় নয়।[২১]

পরোক্ষ সাক্ষী এক ধরনের প্রতিনিধিত্ব। তিনি মূল সাক্ষীর নিয়োগকৃত প্রতিনিধি হিসেবে আদালতের সামনে নিয়োগকর্তার বক্তব্য পেশ করে থাকেন। তিনি মূল সাক্ষীর বক্তব্য অবিকল ও অবিকৃত অবস্থায় আদালতে পেশ করতে বাধ্য।

মূল সাক্ষী যখন কোনো ব্যক্তিকে পরোক্ষ সাক্ষী নিয়োগ করতে চান তখন তাকে সাক্ষ্যের বিষয়বস্তু ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবেন, যাতে আদালতে সঠিকভাবে তা বলতে পারেন।[২২]

(৪) নেতিবাচক সাক্ষ্য : মামলায় বাদীর জবানবন্দী, সাক্ষীদের সাক্ষ্যকে অস্বীকার করে যে বক্তব্য পেশ করা হয় তাকে নেতিবাচক সাক্ষ্য বলে। অন্য কথায় বিবাদীর পক্ষে এবং বাদীর বিপক্ষে যে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় তাকে নেতিবাচক সাক্ষ্য বলে।

---

২১. বাদাইউস সানায়ি, কিতাবুশ শাহাদাত, ৬/২৮১, ২৮২। আলমগীরী, কিতাবুশ শাহাদাত, ৩য় খণ্ড। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৮১।

২২. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

৫. সাক্ষ্যের শর্তাবলী

ইসলামী আইনে সাক্ষ্য প্রদানকারীর জন্য কিছু শর্তাবলী রয়েছে। এ শর্তাবলী পূরণ না হলে তাকে আদালত সাক্ষ্যের অযোগ্য ঘোষণা করেন। যেমন–

(১) সাক্ষীকে প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হতে হবে :

এ সম্পর্কে ফকীহগণ একমত। অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালেগ ব্যক্তি বোধশক্তিসম্পন্ন হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।[২২.ক] অথচ প্রচলিত আইনে অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। প্রচলিত সাক্ষ্য আইনে বলা হয়েছে– 'যদি সে অপরিণত বয়স সত্ত্বেও জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে এবং তার যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিতে পারে, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়।'[২৩]

অপ্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষ্য সম্পর্কে উমার (রা) বলেছেন, কাফির, অপ্রাপ্তবয়স্ক (শিশু) ও দাসের সাক্ষ্য কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন কাফির ব্যক্তি মুসলিম, শিশু প্রাপ্তবয়স্ক এবং দাস মুক্ত হয়ে যায় এবং সাক্ষ্য দেয়ার সময় তারা বিশ্বস্ত থাকে।[২৪]

উসমান (রা) এর মতে, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষীকে অবশ্যই সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য নাবালেগের কাছে যদি কোনো গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য থাকে এবং সে বালেগ হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদান করে তা গ্রহণ করা হবে।[২৫]

আলী (রা) প্রাপ্তবয়স্ক কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না। তবে তার মতে বাদী বিবাদী দু'জনই যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয় তাহলে একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। শর্ত হচ্ছে উভয়ে যদি পৃথক হয়ে না যায়। কোনো একজন পৃথক হয়ে গেলে বড়োদের শিখিয়ে দেয়ার সম্ভাবনা থাকে বলে স্থান ত্যাগ করে পৃথক হওয়ার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[২৬] মাসরূক থেকে বর্ণিত, ছয়জন শিশু নদীতে

---

২২. ক. আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬৩।

২৩. সাক্ষ্য আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী, পৃ. ৩৬৩।

২৪. ফিকহী ইনসাইক্লোপেডিয়া-২, ফিক্‌হ উমার (রা)– ড. রাওয়াস কালাজী, 'শাহাদাত' শিরোনাম, রেফারেন্স মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৮/৩৪৭। আল মুহাল্লা, ৯/৪২১।

২৫. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৮/৮০। সুনানু বাইহাকী, ৬/১০৫। কানযুল উম্মাল, ৭/১১। আল মুগনী, ৫/২৮৫। আল মুহাল্লা, ৯/৮৩।

২৬. কানযুল উম্মাল, হাদীস-১৭৭৮৮। কাশফুল গুম্মাহ্‌, ২/২০৩।

www.bjilibrary.com

সাঁতার কাটতে গিয়েছিল। তাদের একজন পানিতে ডুবে মারা যায়। তাদের মধ্যে দু'জন শিশু অবশিষ্ট তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, তারা তিনজন মিলে তাকে ডুবিয়ে হত্যা করেছে। তখন আলী (রা) দিয়াত (রক্তপণ) এর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ সরকারীভাবে পরিশোধ করলেন এবং বাকী দু'ভাগ সেই তিন শিশু (এর অভিভাবক) কে পরিশোধ করার নির্দেশ দেন।[২৭]

(২) সাক্ষীকে মুসলিম হতে হবে :

অনেক ফৌজদারী মামলায় অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হলেও দেওয়ানী আইনে অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থে বলা হয়েছে- সাক্ষীকে মুসলিম হতে হবে। এ সম্পর্কে ফকীহ্গণ একমত। তাই মুসলিমদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অমুসলিমদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে তারা নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষী হতে পারবে।[২৮] কেননা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

'যারা কাফির, তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক।'[২৯]

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَ شَهَادَةَ اَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ.

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অমুসলিম যিম্মীদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।[৩০]

(৩) সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে :

সাক্ষীকে ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী হতে হবে। সমাজে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও পাপাচারী হিসেবে কুখ্যাত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

---

২৭. আল মুহাল্লা, ৯/৪২০। আল মুগনী, ৯/১৬৪। ফিকহী ইনসাইক্লোপেডিয়া-৪, ফিক্হ আলী (রা), ড. রাওয়াস কালাজী, শাহাদাত শিরোনাম।

২৮. ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬৩। বাদাইউস সানায়ী, ৬/২৮২।

২৯. সূরা আল আনফাল, আয়াত-৭৩।

৩০. আল হিদায়া, ৩/১৪৭, টীকা-১০।

www.bjilibrary.com

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

'সাক্ষীদের মধ্যে যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট।'[৩১]

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ.

'এমন দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও, তোমাদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ।'[৩২]

সূরা আল বাকারা এর ২৮২ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মওদূদী (রহ) বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, যে কোনো ব্যক্তি সাক্ষী হবার যোগ্য নয়। বরং এমন সব লোককে সাক্ষী করতে হবে যারা নিজেদের নৈতিক চরিত্র ও বিশ্বস্ততার কারণে সাধারণভাবে লোকদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য বলে পরিচিত।'[৩৩]

ইসলামী ফিক্‌হে ন্যায়পরায়ণতা (عدالت) এর বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যেমন– 'যার বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ নেই তিনিই ন্যায়পরায়ণ।'[৩৪] 'যার সৎকাজ বেশি এবং অসৎকাজ কম তিনিই ন্যায়পরায়ণ।'[৩৫] 'যে ব্যক্তি কবীরাহ্ গুনাহ্ পরিহার করেন ও অবশ্য পালনীয় ফরয আদায় করেন এবং যার খারাপ কার্যকলাপের তুলনায় সৎকর্মই প্রসিদ্ধ তিনি ন্যায়পরায়ণ।'[৩৬] তারপর বলা হয়েছে– 'যে ব্যক্তি তার সামগ্রিক লেনদেনে সৎ বলে পরিচিত, অসৎ কাজের তুলনায় যার সৎ কাজ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যিনি মিথ্যাবাদী বা প্রতারক হিসেবে কিংবা কবীরাহ্ গুনাহে লিপ্ত হিসেবে কুখ্যাত নন্ তিনি ন্যায়পরায়ণ।'[৩৭]

(৪) সাক্ষীকে সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে :

কোনো ব্যক্তি বোধসম্পন্ন বা সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী না হলে তার সাক্ষ্য

৩১. সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৮২।

৩২. সূরা আত তালাক, আয়াত-২।

৩৩. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল বাকারা, টীকা-৩২৮।

৩৪. বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৬৮। বলা হয়েছে- من لم يطعن عليه فى بطن ولافرج فهو عدل

৩৫. প্রাগুক্ত, বলা হয়েছে– من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل

৩৬. প্রাগুক্ত, বলা হয়েছে–

من يجتنب الكبائر وادى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته فهو عدل.

৩৭. প্রাগুক্ত, বলা হয়েছে–

اذا كان الرجل صالحا فى اموره تغلب حسناته سيئاته ولايعرف بالكذب ولاَ بشىء من الكبائر.

www.bjilibrary.com

গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাক্ষী হওয়ার অর্থই হলো ঘটনা অনুধাবন করা এবং তা স্মরণ রাখা। এটি বোধশক্তি ও স্মৃতিশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ফকীহ্গণ একমত।[৩৮]

(৫) সাক্ষীকে বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে :

ইসলামী আইনে সাক্ষীকে অবশ্যই বাকশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। বাকশক্তিহীন বা বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী ফকীহ্ (ইসলামী আইন বিশারদ)গণ একমত।[৩৯] মালিকী ফকীহ্দের কাছে বাকশক্তিহীন বা বোবার সুস্পষ্ট ইশারা-ইঙ্গিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৪০] অবশ্য প্রচলিত সাক্ষ্য আইনও মালিকী ফকীহ্দের মতের অনুকূলে। প্রচলিত সাক্ষ্য আইনের ১১৯ ধারায় বলা হয়েছে– 'যে সাক্ষী কথা বলতে অক্ষম, তিনি তার বক্তব্য অন্য কোনোভাবে, অর্থাৎ লিখে বা ইশারা করে বুঝাতে পারেন এবং সেভাবে সাক্ষ্য দিতে পারেন, তবে সেই লিখা বা ইশারা প্রকাশ্য আদালতে লিখতে বা করতে হবে। এভাবে যে সাক্ষ্য দেয়া হবে তা মৌখিক সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে।'[৪১]

(৬) যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা হবে সেই বিষয় সাক্ষীগণের জ্ঞাত থাকতে হবে :

সাক্ষীগণ যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবেন সেই বিষয় তাদের জ্ঞাত থাকতে হবে। অনুমানের ভিত্তিতে বা কারও মুখে বর্ণনা শুনে সাক্ষ্য প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য নয়।[৪২] এ সম্পর্কে প্রচলিত আইনের সাক্ষ্য আইন ধারা-৬০ এ বলা হয়েছে– 'মৌখিক সাক্ষীকে সকল ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে হবে। অর্থাৎ এটি যদি এমন বিষয় সম্পর্কে হয় যা দেখা যেতে পারে তবে সাক্ষী বলবেন, তিনি তা দেখেছেন। তার সাক্ষ্যই দিতে হবে। এটি যদি এমন বিষয় সম্পর্কে হয়, যা শোনা

---

৩৮. আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬২। বাদাইউস সানায়ী, ৬/২৬৬। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড ২য় ভাগ, পৃ. ২৫৭।

৩৯. আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬৪। ফাতওয়া আলমগীরী, ৩/৪৫০।

৪০. আল মুগনী, ৯/১১০। আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/১৬৪। হাশিয়াতুদ্ দাসূকী আলা শারহিল কাবীর, ৪/১৬৮ এর রেফারেন্সে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৫৮।

৪১. সাক্ষ্য আইন, বাসুদের গাঙ্গুলী এবং সাক্ষ্য আইন, এটি এম কামরুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাইফুল আলম, উভয় গ্রন্থের প্রকাশক খোশরোজ কিতাব মহল, বাংলাবাজার, ঢাকা।

৪২. বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৭২। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৬০।

www.bjilibrary.com

যেতে পারে, তবে সাক্ষী বলবেন, তিনি তা শুনেছেন। তার সাক্ষ্যই দিতে হবে। আর যদি এমন বিষয় সম্পর্কে হয় যা অন্য কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে তবে সেই সাক্ষী বলবেন, তিনি তা ইন্দ্রিয় দিয়ে সেইভাবে উপলব্ধি করেছেন, তার সাক্ষ্যই দিতে হবে। এটি যদি কারও অভিমত অথবা অভিমতের ভিত্তি সম্পর্কে হয়, তবে যিনি সেই ভিত্তিতে সেই অভিমত পোষণ করেন তার সাক্ষ্যই দিতে হবে।'[৪৩]

(৭) আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে :

সাক্ষীগণকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। কারণ আদালত সাক্ষীগণের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে রায় প্রদান করে থাকে এবং তার রায়ের দ্বারা সাক্ষ্যের কার্যকারিতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪৪]

(৮) সাক্ষ্যদান নিঃস্বার্থ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে :

সাক্ষীকে নিঃস্বার্থ, প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে। তিনি কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ.

'হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে। কোনো জাতি-গোষ্ঠির প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করবে, এটি তাকওয়ার নিকটতর এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।'[৪৫]

সাক্ষ্যদানের আড়ালে কোনো স্বার্থ থাকতে পারবে না। বাদাইউস সানায়ী গ্রন্থে বলা হয়েছে–

لاَ شَهَادَةَ لِجَارِ الْمَغْنَمِ وَلاَ لِدَافِعِ الْمَغْرَمِ.

৪৩. সাক্ষ্য আইন, বাসুদের গাঙ্গলী পৃ. ১৮৯, খোশরোজ কিতাব মহল কর্তৃক প্রকাশিত।

৪৪. বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৭৭। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রাগুক্ত।

৪৫. সূরা আল মায়িদা, আয়াত-৮।

www.bjilibrary.com

'যে ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় কিংবা ঋণমুক্ত হতে চায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৪৬]

ইসলাম সাক্ষীগণকে এতটা প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষ দাবী করে যে, পুত্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিতা সাক্ষী কিংবা বাপমায়ের স্বার্থের অনুকূলে পুত্র সাক্ষী এবং স্বামী স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাক্ষী হতে পারে না।[৪৭] বাদাইউস সানায়ী গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে–

لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلاَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلاَ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ.

'সন্তানের অনুকূলে পিতার সাক্ষ্য, পিতার অনুকূলে সন্তানের সাক্ষ্য, স্বামীর অনুকূলে স্ত্রী এবং স্ত্রীর অনুকূলে স্বামীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৪৮]

(৯) সাক্ষী বিপরীত পক্ষের শত্রু হতে পারবে না :

কোনো ব্যক্তি তার শত্রুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ পেলে সে তার সদ্ব্যবহার করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন–

لاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَّلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ ذِىْ غِمْرٍ عَلى اَخِيْهِ.

'বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতকিনী ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৪৯]

তেমনিভাবে শত্রুর সাক্ষ্যের ব্যাপারে বলেছেন–

وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِيْنٍ.

'শত্রু ও অপবাদযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।'[৫০]

---

৪৬. বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৭২।

৪৭. আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬৮।

৪৮. বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৭২।

৪৯. সুনান ইবনু মাজাহ্‌. শাহাদাত (সাক্ষ্য) অধ্যায়, হাদীস-২৩৬৬। সুনানু আবী দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, সুনানু বাইহাকী ইত্যাদি গ্রন্থের রেফারেন্সে আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬৮।

৫০. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সুনানু বাইহাকী ও মুসতাদরাক হাকিম এর রেফারেন্সে আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৬৮।

www.bjilibrary.com

অবশ্য প্রচলিত আইনে সাক্ষ্যের জন্য সকল ব্যক্তিই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণযোগ্য। সাক্ষ্য আইনের ১১৮ ধারায় বলা হয়েছে– 'সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। যদি আদালত মনে না করেন যে, তারা অল্পবয়স্ক, অতিবৃদ্ধ, দৈহিক বা মানসিক ব্যাধি বা অনুরূপ কোনো কারণে তাদেরকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে বা সেই প্রশ্নের যুক্তিসংগত উত্তর দিতে অক্ষম।'[৫১] তবে ধারা-৫ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– 'যেখানে সাক্ষী আসামীর প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন; সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অতিসতর্কতার সাথে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।[৫২]

(১০) সাক্ষীদের সাক্ষ্যের মধ্যে মিল থাকতে হবে :

সাক্ষীদের পরস্পরের বিবৃতির মধ্যে অবশ্যই মিল থাকতে হবে এবং যে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবে তার সাথেও সংগতিপূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে শব্দগত ও ভাবার্থগত উভয় দিক হতে মিল থাকতে হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে ভাবার্থগত মিল থাকাই যথেষ্ট।[৫৩] আর এ মতের ওপরই ফাতওয়া। যেমন কোনো মাল বাদীকে হেবা করা হয়েছে বলে একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু আরেকজন সাক্ষী বললেন বাদীকে উপহার দেয়া হয়েছে এক্ষেত্রে তাদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য হবে।[৫৪]

কোনো বস্তুর পরিমাণ নিয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতভেদ হলে যেই পরিমাণের ওপর সাক্ষীদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই পরিমাণের ওপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন– বাদী যে পরিমাণ ঋণের দাবী করেছেন একজন সাক্ষী সেই পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণের অনুকূলে সাক্ষ্য দিলেন কিন্তু আরেকজন কম পরিমাণের অনুকূলে সাক্ষ্য দিলেন। এক্ষেত্রে কম পরিমাণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৫৫] কারণ যিনি কম পরিমাণের কথা বলেছেন আর যিনি বেশি

৫১. সাক্ষ্য আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী, পৃ.৩৬১, খোশরোজ কিতাব মহল কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল-২০০৮ (পুনর্মুদ্রণ)।

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১।

৫৩. আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৭৩ (টীকা-১)। বাদাইউস সানায়ী, ৬/২৭৩।

৫৪. বিধিবদ্ধ ইসলামী, আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৮২।

৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮২।

www.bjilibrary.com

পরিমাণের কথা বলেছেন সেই বেশি পরিমাণের মধ্যে কম পরিমাণ অংশও নিহিত রয়েছে। ধরা যাক ঋণের দাবীদার দাবী করলেন ২০ হাজার টাকা। একজন সাক্ষী দিলেন পাওনা টাকার পরিমাণ ১৫ হাজার টাকা, আবার আরেকজন সাক্ষী দিলেন পাওনা টাকার পরিমাণ ২২ হাজার টাকা। এক্ষেত্রে ১৫ হাজার টাকা ধর্তব্য হবে এজন্য যে, বাদী ও একজন সাক্ষী পরিমাণ বেশি বললেও প্রত্যেকের বক্তব্যের মধ্যেই ১৫ হাজার টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(১১) সাক্ষ্যের ভাষা :

'আমি দেখেছি' কিংবা 'আমি শুনেছি' বা 'আমার সামনে এরূপ ঘটেছে' এসব বাক্যে সাক্ষ্য দিলে আদালতে সেই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য কিছু ফিক্হী গ্রন্থে বলা হয়েছে– সাক্ষ্যদাতাকে সাক্ষ্য প্রদানকালে 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি' এই বাক্য উচ্চারণ করতে হবে। যদি বলে 'আমি অবগত আছি' বা 'আমি নিশ্চিত' এতে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫৬] 'আমি তথ্য প্রদান করছি' 'আমি অবহিত করছি' এরূপ বাক্য অথবা অনুরূপ অর্থবোধক বাক্যের মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করা যাবে না।[৫৭] তবে প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের পর দ্বিতীয় সাক্ষী যদি প্রথম সাক্ষীর সাক্ষ্যকে স্বীকৃতি দিয়ে এরূপ বলে প্রথম সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিয়েছেন এই ব্যাপারে আমিও সাক্ষী, এতটুকুতেই দ্বিতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৫৮]

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় আরেকটি মতও পাওয়া যায় এবং তা অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য দান সমাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় সাক্ষী এসে যদি বলে, আমি ঐ সাক্ষ্যই দিচ্ছি যা পূর্ববর্তী সাক্ষী দিয়েছে। অথবা বলে যে, আমি পূর্ববর্তী সাক্ষীর সত্যায়ন করছি। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সাক্ষ্য সঠিক হবে না। কারণ এটি সাক্ষ্য দান নয়। এটি হচ্ছে উপাখ্যান, বিচারকের উচিৎ এক সাক্ষীর সাক্ষ্যকে অপর সাক্ষী দ্বারা সত্যায়ন না করে ঘটনার বিবরণ প্রত্যেক সাক্ষীর কাছ থেকে শব্দে শব্দে শোনা এবং লিপিবদ্ধ করা। এমনটা না করে যদি শুধু একজন সাক্ষীর

---

৫৬. আল হিদায়ার রেফারেন্সে ইসলামী ফৌজদারী আইন, সালামাত আলী খান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ৯।

৫৭. বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৭৩। আল ফিকহুল ইসলামী, ৬/৫৭৪। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৬০।

৫৮. আল খুলাছাহ্ এর রেফারেন্সে ইসলামী ফৌজদারী আইন, পৃ. ০৯।

www.bjilibrary.com

বর্ণনাকে অপর সাক্ষীদের দ্বারা সত্যায়িত করিয়ে নেয়া হয় তাহলে এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৫৯]

(১২) আদালতের দৃষ্টিতে সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হওয়া :

কোনো পক্ষ সাক্ষীগণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করুক বা না করুক, আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য।[৬০]

(১৩) অপরিচিত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় :

যার সাথে কোনো পরিচয় নেই, লেনদেন নেই তিনিই অপরিচিত। এরূপ অপরিচিত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৬. মহিলাদের সাক্ষ্য

ইসলাম মানুষ হিসেবে নারী পুরুষে পার্থক্য করে না। মানুষের ওপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে দায়ভার অর্পণ করেছেন তা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান। যেমন নামায, রোযা, হজ, যাকাত, দীনি শিক্ষা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ইত্যাদি। এসব বিষয়ে উভয়কে সমানভাবে দায়ী করা হবে এবং উভয়কে সমান বিনিময় দেয়া হবে। কিন্তু লিঙ্গ ও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে পুরুষ ও মহিলাকে পৃথক করা হয়েছে এবং সেই কারণে তাদের কর্মক্ষেত্রও আলাদা করে দেয়া হয়েছে। পুরুষরা বাইরে কাজকর্ম করবে এবং স্ত্রী সন্তানের ভরণ পোষণ ও

---

৫৯. ولو بدأ الاول فاستوفى الشهادة وقال الثانى "اشهد بمثل ما شهد به لم تصح شهادته حتى يستوفيها لفظا كالاول لانه موضع اداء وليس موضع حكاية.
(ادب القاضى، ج - ٢، صـ٢٤٨)

ذكر الخصاف ولو شهد شاهد وفسر الشهادة على وجهها ثم شهد الآخر فقال اشهد على مثل شهادة صاحبى، لايقبل القاضى حتى يتكلم الاخر بشهادته ـ لان هذا محتمل يحتمل ان يكون المراد اشهد على مثل شهادته من اوله وآخره او من خلاله فيضم الشاهد شيئا فى هذه الشهادة فيحترز عن الوبال ولايلبس على القاضى. (معين الحكام، صـ ١٠٠)

৬০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৮৩।

www.bjilibrary.com

অভিভাবকত্ব করবে। আর মহিলারা বাড়িতে কাজকর্ম করবে এবং সন্তান ও স্বামীর সংসার সামলাবে। পুরুষ ও মহিলাদের এটিই স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র।[৬১]

তাই যে কোনো সমাজে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের বাড়ির বাইরে যাতায়াত তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বিশেষ করে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বাইরে যাতায়াত আরও কম। ইসলামী আইন সর্বাবস্থায় নারীকে মামলা মোকদ্দমার মত ঝামেলাপূর্ণ ও বিবদমান বিষয়ের সাথে পারতপক্ষে জড়াতে চায় না। তাছাড়া নারীগণ সৃষ্টিগতভাবেই সাধারণত কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে রক্তপাত দেখলে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই স্বভাবগত দুর্বলতার কারণে তাদেরকে হদ্ এর আওতাধীন বিষয়ে সাক্ষী করা হয়নি। এটি তাদের জন্য বিরাট দায়মুক্তিস্বরূপ। তারপরও কিছু হাদীসের বিবরণে দেখা যায় একজন মাত্র মহিলা কর্তৃক অপরাধীকে সনাক্ত করার এবং অপরাধীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোরতম শাস্তি কার্যকর করেছেন। তাই হদ্ সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে ঘটনার বিবরণ, স্থান ও আদালতের সংগৃহীত তথ্য প্রমাণের সাথে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার প্রদত্ত জবান বন্দীর মিল থাকলে এ অবস্থায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। যেমন– দুষ্কৃতিকারীরা কোনো বাড়িতে প্রবেশ করে মা, বোন, স্ত্রী বা কন্যার সামনে এক ব্যক্তিকে হত্যা করলো, তাদের মধ্যে কোনো একজন মহিলা অপরাধীকে আদালতে সনাক্ত করলেন। এখন বিচারকের সংগৃহীত তথ্য ও উক্ত মহিলার বক্তব্যে সামঞ্জস্য থাকলে তার সাক্ষ্য অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।[৬২] কারণ সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য মুমিন পুরুষের যেরূপ দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, মুমিন নারীরও অনুরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আর সাক্ষ্যের দ্বারাও সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।

যেহেতু ইসলাম মহিলাদেরকে আইন আদালতের মতো জটিল বিষয়ে ঝামেলা মুক্ত রাখতে চায়– তাই 'হদ'[৬৩] 'কিসাস',[৬৪] ইত্যাদি ফৌজদারী বিষয়ে নারীদের সাক্ষী হবার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে।

---

৬১. আল হিজাবের মর্মকথা, মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত।

৬২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৬৮. ২৭০।

৬৩. হদ্ শব্দের আভিধানিক অর্থ প্রতিরোধ, বাধা, সীমানা, চৌহদ্দি ইত্যাদি। শরঈ পরিভাষায় আল্লাহ্‌র অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কিংবা তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে যে শাস্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাকে হদ্ বলা হয়। -আন নিহায়া ফী গারিবিল হাদীস, ১ম খণ্ড; মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা।

৬৪. হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়াকে ইসলামী আইনে কিসাস বলা হয়।

www.bjilibrary.com

৭. যেসব ক্ষেত্রে নারীদের সাক্ষ্য আবশ্যক

ফৌজদারী আইনে মহিলাদের সাক্ষ্যকে নিরুৎসাহিত করা হলেও দেওয়ানী আইনে এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেখানে মহিলাদের সাক্ষ্য অপরিহার্য। যেমন নসব (বংশ প্রমাণ), দুধপান, মেয়েদের বয়োপ্রাপ্ত হওয়া, ধর্ষণ কিংবা অন্য কোনো কারণে মহিলাদের দাবীর সত্যতা নিরূপণ ইত্যাদি। প্রশ্ন হতে পারে এসব বিষয়ে ন্যূনতম ক'জন মহিলার সাক্ষ্য আদালত গ্রহণ করবে। চতুর্থ খলীফা আলী ইবনু আবী তালিব (রা) এর মতে– মেয়েদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হলেও যেসব ক্ষেত্রে একাধিক মহিলা কর্তৃক জানা সম্ভব, সেসব ক্ষেত্রে একজন মহিলার সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে আদালত রায় দিতে পারে না। কমপক্ষে দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন। কাতাদা (রহ) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা তালাকপ্রাপ্তা হলেন এবং চল্লিশ দিনের মধ্যে তার তিনবার রক্তস্রাব (মাসিক) হলো। মামলা কাযী শুরাইহ্ (রহ) এর আদালতে ওঠলো। তিনি এ মামলা আলী (রা) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি রায় দিলেন, যদি চারজন মহিলা এ সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, চল্লিশ দিনে তিনবার মাসিক হওয়া অসম্ভব নয় তাহলে সে স্বামী থেকে পৃথক হয়ে যাবে। না হয় তাকে পুরো তিন মাস অপেক্ষা করতে হবে।[৬৫] অবশ্য এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে যেখানে একজন মহিলার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আদালত রায় দিতে পারে। যেমন– কোনো মহিলা কুমারী কিনা, কোনো মহিলার মাসিক শেষ হয়েছে কিনা, কোনো সন্তানের একাধিক দাবীদার হলে সন্তান প্রকৃতপক্ষে কার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে, সন্তান জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়েছে কিনা, যদি জীবিত জন্মগ্রহণ করে থাকে তাহলে সেই সন্তান মৃত্যুর আগে শব্দ করেছে কিনা কিংবা কোনো মহিলার মধ্যে শারীরিক ত্রুটি রয়েছে কিনা ইত্যাদি।

সন্তানের বংশ পরিচয় নিয়ে মতভেদ হলে সেক্ষেত্রে ধাত্রী বা মহিলা ডাক্তারের একক সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৬৬]

৮. বিবাদীর স্বীকারোক্তি ও একজন মহিলার সাক্ষ্য

যেখানে অন্তত দু'জন সাক্ষীর প্রয়োজন, তেমন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু

৬৫. আল মুহাল্লা, ১০/২৭২। ফিক্হ আলী (রা) শাহাদাত শিরোনাম।

৬৬. আল-হিদায়াহ্, ৩/১৩৯। আলমগীরী, ৩/৪৬৫।

www.bjilibrary.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন মাত্র মহিলার সাক্ষ্য ও বিবাদীর স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ফায়সালা দিয়েছেন। এমন তিনটি নজীর উত্থাপন করা হলো।

নজীর-১ : উকবা ইবনু হারিছ বলেছেন, আমি এক মহিলাকে বিয়ে করি। এক কালো মহিলা এসে বললেন, আমি তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এসে বললাম– আমি এক মহিলাকে বিয়ে করেছি, এখন এক কালো মহিলা এসে বলছেন আমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছেন। অথচ তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি তাঁর সামনা সামনি এলাম। আবারো তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন আমি বললাম, অবশ্যই তিনি মিথ্যে বলছেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, তা কি করে হয়, অথচ সে দাবী করছে তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছে। তুমি তাকে (স্ত্রী) ছেড়ে দাও।[৬৭]

নজীর-২ : ক্ষতিগ্রস্ত মহিলা কর্তৃক অপরাধীকে সনাক্ত করার ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। এক ইহূদী একটি পাথরের ওপর মাথা রেখে আরেকটি পাথর দিয়ে মাথা থেতলে দিয়ে এক যুবতী থেকে তার অলংকার ছিনিয়ে নেয়। মুমূর্ষ অবস্থায় মেয়েটিকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে উপস্থিত করা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন অমুক ব্যক্তি কি তোমাকে আহত করেছে? সে মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি আবার বললেন, তাহলে কি অমুক ব্যক্তি এরূপ করেছে? সে এবারও মাথার ইশারায় বললো, না। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবার প্রশ্ন করলেন, অমুক

---

৬৭. মূল হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَرْثِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُكُمَا وَهِىَ كَاذِبَةٌ ـ قَالَ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ قَالَ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَاَعْرَضَ عَنِّىْ بِوَجْهِهِ. فَقُلْتُ اِنَّهَا كَاذِبَةٌ ـ قَالَ وَكَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ اَنَّهَا قَدْ اَرْضَعَتْكُمَا ـ دَعْهَا عَنْكَ ـ (ترمذى حديث : ١١٥٢)

www.bjilibrary.com

ইহূদী কি এমন করেছে? এবার মেয়েটি মাথা নেড়ে বললো, হাঁ। তখন তাকে গ্রেফতার করে আনা হলো। সে অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবাব বন্দী দেয়। যুবতী মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন।[৬৮]

নজীর-৩ : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সময়ে এক মহিলা মসজিদে নববীতে ফজর নামায পড়তে যাচ্ছিলেন। এক ব্যক্তি জোরপূর্বক তাকে ধর্ষণ করে। তার চিৎকারে লোকজন এসে অপরাধীকে ধরে ফেলে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে তাকে উপস্থিত করা হলে উক্ত মহিলা তাকে সনাক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেন।[৬৯]

৯. দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে এককভাবে মহিলাদের সাক্ষ্য

দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে এককভাবে মহিলাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করা হয়েছে এমন ব্যতিক্রমী নজীরও রয়েছে। ব্যতিক্রমী বলছি, কারণ– এসব নজীর খুবই কম। তবু যেহেতু নজীর রয়েছে তাই উল্লেখ করা হলো।

---

৬৮. জামি আত্তিরমিযি, রক্তপণ অধ্যায়, হাদীস-১৩৯৮ (ই,ফা)। সহীহ্ মুসলিম, কসম অধ্যায়, হাদীস-৪২১৮ (ই,ফা)। সুনান আবু দাউদ, রক্তপণ অধ্যায়, হাদীস-৪৪৬৪। সহীহ্ আল বুখারী, নাসাঈ ও ইবনু মাজায়ও হাদীসটি রয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসটি নিম্নরূপ–

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَسَأَلُوْهَا مَنْ صَنَعَ هذَا بِكِ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتّٰى ذَكَرُوْا يَهُوْدِيًا فَاَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَاُخِذَ الْيَهُوْدِيُّ فَاَقَرَّ فَاَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُرَضَّ رَأْسُهَا بِالْحِجَرَةِ -

৬৯. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ/সুনানু ইবনু মাজাহ্, হাদীস-২৫৯৮ (ই,ফা)। জামি আত্তিরমিযি, হা-১৪৫৯, ১৪৬০ (ই,ফা)। তিরমিযি বর্ণিত হাদীসটি নিম্নরূপ–

اُسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَاَقَامَهُ عَلَى الَّذِىْ اَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرْ اَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. (ترمذى)

অর্থ : 'নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে এক মহিলার সাথে জোরপূর্বক যিনা করা হয়, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত মহিলাটির হদ (দণ্ড) মওকুফ করেন এবং যে পুরুষটি এ কাজ করেছিলো তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করেন। তবে তিনি মহিলাটির জন্য মহর সাব্যস্ত করেছিলেন কিনা রাবী তা উল্লেখ করেননি।' উল্লেখ্য যে এরূপ ঘটনায় পুরুষের উপর মহরে মেছেল ওয়াজিব হয় যা অন্যান্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়।

www.bjilibrary.com

নজীর-১ : উমার (রা) এর কাছে আম্মানের অধিবাসী এক ব্যক্তির মামলা দায়ের করা হয়েছিলো, যে মদপান করে মাতাল অবস্থায় তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছিলো। সেই মামলার সাক্ষী ছিলেন চারজন মহিলা। উমার (রা) সেই মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে 'তালাক মুগাল্লাযা' কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছিলেন।[৭০]

নজীর-২ : আলী (রা) একজন পুরুষ সাক্ষীর বিপরীতে যদি দু'জন মহিলা সাক্ষ্য পাওয়া যেত তাহলে তিনি শুধু মহিলাদের সাক্ষ্যও গ্রহণ করতেন। আবু তাল্‌ক (রহ) থেকে বর্ণিত। তাকে তার বোন হিন্দা বলেছেন– আমি ক'জন মহিলার সাথে বসা ছিলাম। আমাদের সামনে একটি শিশুর ওপর চাদর পড়ে গিয়েছিলো। এমন সময় সেখান দিয়ে এক মহিলা যাচ্ছিলো। বাচ্চাটি তার পদদলিত হয়ে মারা যায়। বাচ্চার মা সেই মহিলাকে বলে, আল্লাহ্‌র শপথ, তুমি আমার বাচ্চাকে হত্যা করেছো। মামলা আলী (রা) এর আদালতে ওঠানো হলো। দশজন মহিলা সাক্ষ্য দিলেন। আমি ছিলাম দশম সাক্ষী। আলী (রা) সেই মহিলার ওপর দিয়াত (রক্তপণ) ধার্য করলেন এবং শিশুর মাকে সাহায্যস্বরূপ আরও দু'হাজার (দিরহাম) দিলেন।[৭১]

ইমাম যুহরী যদিও বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ও তাঁর পরের দু'খলীফার সময় হতে হদ্ এর আওতাভুক্ত বিষয়ে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি, কিন্তু তাঁর এ মত রিওয়ায়াত ও দিরায়াতসহ বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। বিশেষ করে তিনি তাঁর উপরিউক্ত মতের সমর্থনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা খুলাফা-ই রাশিদীনের আমলের কোনো আদালতের নজীর পেশ করতে পারেননি। দ্বিতীয়ত: তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণীও নয়। কোনো সাহাবীর বক্তব্যও নয় বরং একজন তাবিঈর বক্তব্য মাত্র।[৭২] তাই আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই বিষয়ে ফকীহ্‌দের পুনর্বিবেচনার সুযোগ রয়েছে।[৭৩]

---

৭০. আল মুহাল্লা, ৯/৩৯৭। ফিকহ্ উমার (রা) ড. রাওয়াস কালাজী, সাক্ষ্য শিরোনাম।

৭১. মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২/১২৩। আল মুহাল্লা ৯/৩৯৮। ফিক্‌হ আলী (রা) ড. রাওয়াস কালাজী, শাহাদাত শিরোনাম।

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯।

www.bjilibrary.com

১০. চুক্তি আইনে দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমতুল্য

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ করে চুক্তি আইনের বেলায় দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান। এ সিদ্ধান্ত স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিপালন করছেন। এ নিয়ে তথাকথিত নারীবাদীরা আপত্তি করে থাকেন। কিন্তু এ বিষয়টি নারী পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত কোনো পার্থক্য নির্দেশ করে না। বরং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই পার্থক্য করা হয়েছে। এ রকম অনেক বিষয়েই নারী পুরুষের কিছুটা পার্থক্য করা হয়েছে। সেজন্য তো কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যেমন– হজের ইহ্রামের সময় পুরুষরা শুধু দুটো চাদর ব্যবহার করে, একটি লুঙ্গি কিংবা পাজামার বিকল্প হিসেবে অন্যটি চাদর হিসেবে। কিন্তু মহিলারা পাজামা কামিস পরেই ইহ্রাম বেঁধে থাকেন। শুধু তাদের মুখমণ্ডল খোলা রাখতে হয়। স্বামী সন্তানদের ভরণ পোষণের কোনো দায় মহিলাদের ওপর নেই, পক্ষান্তরে স্ত্রী সন্তানদের ভরণ পোষণের দায় পুরুষের ওপরই ন্যস্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক নারীদের মাসিকের দিনগুলোতে যে নামায কাযা হয় তা মাফ। এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ওপর বিশেষ ইহ্সান। অপরপক্ষে একজন পুরুষ প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাযও মাফ নেই। যদি সফরে যায় তবু সংক্ষিপ্ত (কসর) নামায পড়তে হয়। তেমনিভাবে নারীদের ওপর জিহাদ (কিতাল) ফরয নয়, পুরুষের জন্য ফরয।

কোনো নারী কোনো পুরুষকে হত্যা করলে ইসলামী আইন অনুযায়ী তার যেমন মৃত্যুদণ্ড হবে তদ্রূপ কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে হত্যা করে তার শাস্তিও মৃত্যুদণ্ড। অনুরূপভাবে নারী পুরুষের দিয়াত (রক্তপণ) এর মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। যেখানে জীবন ও রক্তের মূল্যের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য করা হয়নি সেখানে অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য করা হলেও তার যুক্তিসংগত কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৭৪]

এখানে আরেকটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া শরঈ দৃষ্টিতে একটি ইবাদাত। আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র নির্দেশকে যথাযথভাবে পালন করাই উদ্দেশ্য। এখানে ব্যক্তি মর্যাদার প্রশ্নই অবান্তর। আমরা উপরে উল্লেখ করেছি অনেক ইবাদাতের ধরন পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পৃথক হলেও ছাওয়াব কমবেশি করা হবে না। তেমনিভাবে একজন পুরুষের সমান দু'জন

৭৪. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৭১।

www.bjilibrary.com

মহিলার সাক্ষ্য গণ্য করা হলেও সাক্ষ্য দেয়ার বিনিময়ে যে ছাওয়াব রয়েছে তা উভয়েই সমান পাবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاتَنِ.

'এবং নিজেদের পুরুষদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তিকে সেই বিষয়ে সাক্ষী রাখ। আর যদি দু'জন পুরুষ না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী হবে।[৭৫]

সহীহ্ আল বুখারীতে বলা হয়েছে–

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.

'নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক'।[৭৬]

আলী (রা) বলেছেন, অর্থনৈতিক বিষয়ে শুধু মহিলাদের সাক্ষ্য ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ তার সাথে পুরুষ সাক্ষী না থাকবে। এমনকি একটি দিরহামের ব্যাপার হলেও।[৭৭]

১১. অন্ধের সাক্ষ্য

ইমাম আল বুখারী কিতাবুশ শাহাদাহ্ অধ্যায়ের ১৬৫২ পরিচ্ছেদে বলেন, কাসিম (রহ), হাসান আল বাসরী (রহ), ইবনু সীরীন (রহ), যুহরী (রহ) এবং আতা (রহ) অন্ধের সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন। ইমাম শাবী (রহ) বলেন, অন্ধ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনে (ধারা-৫৭৭) বলা হয়েছে–

যে ক্ষেত্রে সরাসরি দেখার প্রয়োজন হয় না সে ক্ষেত্রে শুনে ঘটনা অবহিত হয়ে অন্ধের সাক্ষ্য প্রদান বৈধ, যদি তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় সুস্থ্ হয়।[৭৮]

অন্ধের দর্শন শক্তি না থাকলেও তার শ্রবণশক্তি সুস্থ্ থাকলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে

---

৭৫. সূরা আল বাকারা, আয়াত-২৮২।

৭৬. সহীহ আল বুখারী, হাদীস-২৪৮২।

৭৭. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৮/৩৩২। আল মুহাল্লা, ৯/৩৯৬।

৭৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৭৭।

www.bjilibrary.com

ঘটনার বিবরণ শুনে একজন অন্ধ আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৭৯]

আলী (রা) বলেছেন, অন্ধ যদি শোনা ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে চান তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। শর্ত হচ্ছে যদি তার শ্রবণ ইন্দ্রিয় ভালো থাকে।[৮০] ঘটনা সংঘটিত হবার সময় যদি কেউ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন থাকে পরে কোনো কারণে সাক্ষ্য দেবার আগেই অন্ধ হয়ে যায় এমতাবস্থায় তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

উসমান (রা) এর মতে অন্ধের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৮১] কারণ সে সাক্ষ্য প্রদানের সময় বাদী-বিবাদীকে সনাক্ত করতে পারে না।

১২. এক চক্ষুহীন ব্যক্তির সাক্ষ্য

উসমান (রা) চাঁদ দেখা সম্পর্কে এক চোখ অন্ধ এমন ব্যক্তির (একক) সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না যতক্ষণ দ্বিতীয় কোনো সাক্ষ্য না পেতেন। কারণ তার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল অথচ চাঁদ দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়া উচিত।[৮২]

১৩. অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাক্ষ্য

অপ্রাপ্তবয়স্ক কর্তৃক অপ্রাপ্তবয়স্ককে হত্যা বা আহত করার ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক (নাবালেগ) এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৮৩]

ইমাম মালিক (রহ) এর মতে হত্যা ও আহত করার ঘটনায় নাবালেগ পরস্পরের সাক্ষী হতে পারে।[৮৪]

উসমান (রা) এর মতে অপ্রাপ্তবয়স্কের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য অপ্রাপ্তবয়স্কের কাছে যদি কোনো গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য থাকে এবং সে বয়োপ্রাপ্ত (বালেগ) হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রদান করে তা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি সে নাবালেগ অবস্থায় সাক্ষ্য প্রদান করে তা নাকচ হয়ে যাবে। নাবালেগ হওয়ার কারণে একবার সাক্ষ্য নাকচ

---

৭৯. আল ফিক্‌হুল ইসলামী, ৬/৫৬৮, ৫৬৯।

৮০. আল মুগনী, ৯/১৮৯। ফিক্‌হ আলী (রা), শাহাদাত শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

৮১. ফিক্‌হ উসমান (রা) শাহাদাত শিরোনাম দ্রষ্টব্য। হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২/১০২।

৮২. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৪/১৬৭।

৮৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৭৯।

৮৪. আল ফিক্‌হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ৬/৫৮২।

www.bjilibrary.com

হয়ে গেলে বালেগ হওয়ার পর সেই সাক্ষ্য পুনরায় দিতে চাইলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হাঁ যদি প্রথমবার নাকচ না হয় তাহলে বালেগ হওয়ার পর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৮৫]

উমার (রা) এর অভিমতও উসমান (রা) এর অনুরূপ। তবে উমার (রা) এর মতে নাবালেগ ক্রীতদাস ও কাফির অবস্থায় কোনো ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে নাবালেগ বালেগ হওয়ার পর এবং ক্রীতদাস স্বাধীন হওয়ার পর এবং কাফির মুসলিম হওয়ার পর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৮৬]

আলী (রা) অপ্রাপ্তবয়স্কদের পরস্পরের বিরুদ্ধে দেয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া বড়োদের বিরুদ্ধে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষ্য গ্রহণ করতেন না। আর তিনি অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষ্য কেবল তখনই গ্রহণ করতেন যখন সে ঘটনাস্থল থেকে বড়োদের সাথে মিলিত না হতো। তিনি মনে করতেন বড়োদের সাথে মিলিত হলে বড়োরা তাদেরকে শিখিয়ে দেবে।[৮৭]

মাসরূক (রহ) থেকে বর্ণিত। ছয়জন বালক নদীতে সাঁতরাতে গিয়েছিলো। তাদের মধ্যে একজন ডুবে মারা গেল। তিনজন বালক দু'জনের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলো। বললো, তারা দু'জন তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আবার সেই দু'জন বালক অপর তিনজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলো। বললো ওরা দু'জন তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। তখন আলী (রা) দিয়াত (রক্তপণ) কে পাঁচ ভাগ করে তিনভাগ চাপালেন দু'বালকের ওপর আর দু'ভাগ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন তিন বালককে।[৮৮]

১৪. যিম্মীর[৮৯] সাক্ষ্য

মুসলিমদের বিষয়ে যিম্মীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যিম্মীদের পারস্পরিক

৮৫. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৮/৮০। আল মুহাল্লা, ৯/৮৩. ৮৪. ৯৯। সুনানু বাইহাকী, ৬/১০৫। কানযুল উম্মাল, ৭/১১। আল মুগনী, ৫/২৮৫, ২৮৯।

৮৬. সুনানু বাইহাকী, ১/১৯৭। আল মুহাল্লা, ৯/৩৯৩। আল মুগনী, ৫/৬৮৮।

৮৭. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৬/৩৫০। কানযুল উম্মাল হাদীস-১৭৭৯১। আল মুহাল্লা, ৯/৪২০। আল মুগনী, ৯/১৬৪।

৮৮. আল মুহাল্লা, ৯/৪২০। আল মুগনী, ৯/১৬৪।

৮৯. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিক। যারা মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার শর্তে একটি নির্দিষ্ট কর (জিযিয়া) দিয়ে বসবাস করার জন্য সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ থাকে। (ফিকহে উসমান (রা.), ড. রাওয়ান কিলাজী)।

www.bjilibrary.com

বিষয়ে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৯০] এ সম্পর্কে সকল মাযহাবের ফকীহ্গণ একমত। হাম্বলী ফকীহ্গণ কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে মুসলিমদের বিষয়ে যিম্মীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তা হচ্ছে সফররত অবস্থায় কোনো মুসলিম ব্যক্তির মৃত্যু সময় উপস্থিত হলে এবং ওসিয়াতের অনুকূলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলিম সাক্ষ্য না পাওয়া গেলে দু'জন অমুসলিম নাগরিককে সাক্ষী বানানো যাবে। তারা তাদের বক্তব্যের সপক্ষে সূরা আল মায়িদার ১০৬ আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। যেখানে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ.

হে ঈমানদারগণ! মৃত্যুর সময় ওসিয়াত করতে চাইলে তোমাদের মধ্যে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখ, না হয় অন্যদের মধ্য হতে দু'জনকে সাক্ষী কর। বিশেষ করে যদি তোমরা সফরে থাকাবস্থায় মৃত্যুকষ্ট তোমাদের কাছে এসে পড়ে।[৯১]

তবে যিম্মী বা অমুসলিমদের পারস্পরিক ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হাদীসে এসেছে এক ইহূদী পুরুষ ও এক ইহূদী নারী ব্যভিচারের লিপ্ত হয়। ইহূদীরা তাদের দু'জনকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে হাজির করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করেন। তারা চারজন সাক্ষী উপস্থিত করলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে ব্যভিচারের দণ্ড দেন।[৯২] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ্ (রা) বলেছেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَجَازَ شَهَادَةَ اَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ.

'নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিম্মীদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষী হওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।'[৯৩]

---

৯০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৮০।

৯১. সূরা আল মায়িদা, আয়াত-১০৬।

৯২. আল ফিক্হুল ইসলামী, ৬/৫৮৬।

৯৩. সুনান ইবনু মাজাহ এর রেফারেন্সে আল হিদায়া, ৩/১৪৭, টীকা-১০।

www.bjilibrary.com

১৫. বোবার সাক্ষ্য

বোবার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৯৪] কারণ সে বাদী বিবাদীকে সনাক্ত করতে পারলেও এবং বিচারাধীন ঘটনা স্বচক্ষে দেখতে পেলেও যেহেতু ইশারা-ইংগিতই তার অবলম্বন, তাই তা স্পষ্ট বক্তব্যের সমতুল্য ও সন্দেহমুক্ত হতে পারে না। এ বিষয়ে হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী ফকীহ্গণ একমত। অবশ্য মালিকী মাযহাবের ফকীহ্গণের মতে বোবার ইশারা-ইংগিতের দ্বারা বিচার্য বিষয় সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৯৫] তবে বোবা ও বধির যদি আদালতে দাঁড়িয়ে নিশ্চিতভাবে লিখিত আকারে নিজ বক্তব্য ব্যক্ত করতে পারে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[৯৬]

১৬. পাগলের সাক্ষ্য

পাগল ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[৯৭] কোনো ব্যক্তি যদি কিছুদিন সুস্থ থাকে এবং কিছুদিন অসুস্থ থাকে তাহলে তার সুস্থ থাকাকালিন অবস্থার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[৯৮] খোশরোজ কিতাব মহল থেকে প্রকাশিত 'সাক্ষ্য আইন' এর ১১৮ ধারার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে– 'সম্পূর্ণরূপে অস্থির বা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কখনই সাক্ষ্য দিতে সক্ষম নয়। তবে সে যদি সাময়িকভাবে সুস্থ থাকে তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায়। মানসিক অস্থিরতা বা মগজের ত্রুটি থাকা খুবই আপেক্ষিক ব্যাপার। কেননা বদ্ধপাগলও সাময়িক সুস্থ থাকাকালিন সময় ঘর সংসার ও কাজকর্ম করে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতে মস্তিষ্ক বিকৃতির ধরন ব্যক্তি বিশেষে পৃথক হয়ে থাকে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, মানসিক অস্থিরতাসম্পন্ন ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন বুঝতে এবং তার যুক্তিসংগত উত্তর দিতে সক্ষম কিনা তা-ই বিবেচ্য বিষয়।'[৯৯]

---

৯৪. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৭৩।

৯৫. আল ফিক্হুল ইসলামী, ৬/৫৬৪। আলমগীরী, ৩/৪৬৪।

৯৬. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৭৩, উপধারা-(ঙ)।

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

৯৮. বিচার সংক্রান্ত মাসয়ালা মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পৃ. ৩৯।

৯৯. সাক্ষ্য আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী, পৃ. ৩৬৩।

www.bjilibrary.com

১৭. নপুংসক (হিজড়া) এর সাক্ষ্য

নপুংসক (হিজড়া) এর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১০০] কারণ সে হয় নারী হবে অথবা পুরুষ। আর শরীআতে নারী পুরুষ উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১০১] সুরাই ইবনু ইয়াহ্ইয়া হাসান বসরী (রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। জারূদ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন কুদামা ইবনু মা'যুন মদপান করেছে। উমার (রা) কুদামাকে বাহ্‌রাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। উমার (রা) জারূদকে প্রশ্ন করলেন, তোমার সাথে আর কোনো সাক্ষী আছে কি? তিনি বললেন, আমার সাথে নপুংসক আলকামাও রয়েছে। উমার (রা) আলকামাকে ডেকে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য দেবে? আলকামা উল্টো প্রশ্ন করলো, নপুংসক হলে সেকি সাক্ষ্য দিতে পারে না? উমার (রা) বললেন, নপুংসক যদি মুসলিম হয় তাহলে তার সাক্ষ্যে বাধা কিসে? তখন আলকামা সাক্ষ্য দিলো, আমি কুদামাহকে চিলমচিতে মদ বমি করতে দেখেছি। শুনে উমার (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি সে মদ পান না করে থাকে তাহলে মদ বমি করতে পারে না। তাকে হদ্ প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন।[১০২]

১৮. দাসের সাক্ষ্য

দাসত্ব অবস্থায় দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১০৩] মুকাতাব,[১০৪] মুদাব্বার[১০৫] এবং উম্মু ওয়ালাদ[১০৬] যতক্ষণ মুক্ত না হয় ততক্ষণ দাস হিসেবেই গণ্য হবে। এদের মধ্যে কেউ যদি দাসত্ব মুক্তির পর সাক্ষ্য দেয়, যে সাক্ষ্য দাসত্ব অবস্থায় দেয়ার কারণে নাকচ হয়ে গিয়েছিলো দাসত্ব মুক্তির পরও সেই সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যাবে। আর যদি দাসত্ব অবস্থায় সাক্ষ্য না দিয়ে দাসত্ব মুক্তির পর সাক্ষ্য দেয় তাহলে সেই

---

১০০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৭৪।

১০১. হিদায়া, ৩/১৪৮। আলমগীরী, ৩/৪৬৯।

১০২. ফিক্‌হ উমার (রা), ডা. রাওয়াস কালাজী, শাহাদাত শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

১০৩. প্রাগুক্ত।

১০৪. যার মনিব দাসকে তার মুক্তিপণ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং বলে এতো দিনের মধ্যে এই পরিমাণ পণ পরিশোধ করতে পারলে তুমি মুক্ত। মনিবের সাথে এরূপ চুক্তিবদ্ধ দাসকে মুকাতাব বলা হয়। (ফিকহে উসমান (রা.), ড. রাওয়ান কিলাজী)।

১০৫. যে ক্রীতদাসকে তার মনিব বলে আমার মৃত্যুর পর তুমি মুক্ত হয়ে যাবে। ঐ ক্রীতদাসকে মুদাব্বার বলে। (ফিকহে উসমান (রা.), ড. রাওয়ান কিলাজী)।

১০৬. যে দাসীর গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাকে উম্মু ওয়ালাদ বলা হয়। মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে উম্মু ওয়ালাদ মুক্ত হয়ে যায়। (ফিকহে উসমান রা.)।

www.bjilibrary.com

সাক্ষ্য নাকচ হবে না, গ্রহণযোগ্য হবে।[১০৭] ইবনু হাযম (রহ্) মুজাহিদ (রহ্) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন, মক্কা ও মদীনাবাসী দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না।[১০৮]

আনাস (রা) বলেছেন, দাস নির্ভরযোগ্য হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১০৯]

আলী (রা) দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন, যদি সেই দাসের মধ্যে সাক্ষ্যের সব শর্তাবলী বর্তমান থাকতো। কাযী শুরাইহ্ (রহ্) বললেন, আমি দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করি না। তখন আলী (রা) বললেন, আমি দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করি। তারপর থেকে শুরাইহ্ (রহ্) দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। কিন্তু মনিবের পক্ষে দাসের সাক্ষ্যকে তাঁরা গ্রহণযোগ্য মনে করতেন না।[১১০] ইবনু সীরীন (রহ্) বলেছেন– দাসের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তবে মনিবের ব্যাপারে নয়।[১১১] এরই ওপর ভিত্তি করে মক্কেলের অনুকূলে উকীলের সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না।

১৯. ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তি ভোগকারীর সাক্ষ্য

'ব্যভিচারের অপবাদ আরোপের কারণে শাস্তি ভোগকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে সকল মাযহাবের ফকীহ্গণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন– যদি সে তাওবা না করে। এটি হচ্ছে হদ্ এর অতিরিক্ত শাস্তি। যেমন আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা বলেছেন– وَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا

(এবং তাদের সাক্ষ্য কোনো দিনই গ্রহণযোগ্য হবে না।)'[১১২]

তবে হদ্ (শরীআহ্ নির্দিষ্ট শাস্তি) প্রয়োগের পর যদি অপবাদদাতা তাওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে সম্পর্কে ফকীহ্দের দুটো মত রয়েছে। হানাফী আইনবিদ (ফকীহ) গণের মতে আয়াতে কারীমার اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. আল মুহাল্লা, ৯/৪১২।

১০৯. সহীহ্ আল বুখারী।

১১০. আল মুহাল্লা, ৯/৪১৩। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ১/২৭৫। কানযুল উম্মাল, হাদীস-১৭৭৯০। আল মুগনী, ৯/১৯৫।

১১১. সহীহ্ আল বুখারী।

১১২. আহকামুল কুরআন-আবু বকর আল জাসসাস, ২/২৭১, ২৭২।

www.bjilibrary.com

(যদি তারা তাওবা করে) এই ব্যতিক্রমমূলক বাক্যটি বাক্যের শেষ অংশের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। যা উল্লেখের দিক থেকে নিকটে, আর তা হলো : أُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُوْنَ। (তারা সকলেই ফাসিক)। এ আয়াতাংশ থেকে বুঝা যায়, যখন তারা তাওবা করবে তখন ফিস্‌ক (দুষ্কৃতি) থেকে পবিত্র হয়ে যাবে। তবে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১১৩] এ দলে রয়েছেন, কাযী শুরাইহ্‌, সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব, সাঈদ ইবনু জুবাইর, হাসান আল বাসরী, ইবরাহীম নাখঈ, ইবনু সীরীন, মাকহুল, আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ, আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, যুফার, মুহাম্মাদ, সুফিয়ান ছাওরি ও হাসান ইবনু সালেহ্‌ (রহ)-এর মত শীর্ষস্থানীয় ফকীহ্‌গণ।[১১৪]

বাকী ফকীহ্‌দের মতে– اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا। (যারা তাওবা করবে) এই ব্যতিক্রমমূলক বাক্যটি বাক্যের শেষ দু'অংশের সাথে গিয়ে মিলিত হবে। আর তা হলো–

وَلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُوْنَ.

'(আর তাদের সাক্ষ্য কোনো দিনও গ্রহণযোগ্য হবে না, তারা সবাই ফাসিক।)'

অর্থাৎ যদি অপবাদদাতা তাওবা করে তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং তার থেকে ফাসেকীও চলে যাবে। মোকটথা সে যখন ভালো লোকে পরিণত হলো তখন তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে।[১১৫]

এই দলে রয়েছে– আতা, তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, সালিম, যুহরী, ইকরামাহ, উমার ইবনু আবদিল আযীয, ইবনু আবি নুজাইহ্‌, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, মাসরূক, দাহ্‌হাক, মালিক ইবনু আনাস, উছমান আলবাত্তি, লাইছ ইবনু সা'দ, শাফিঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইবনু জারীর আত্‌ তাবারীর মতো শ্রেষ্ঠ ফকীহ্‌বৃন্দ।[১১৬]

তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসকেও দলিল হিসেবে পেশ করেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ.

---

১১৩. রাওয়ায়িউল বায়ান মুহাম্মাদ আলী আস সাবূনী, ২/৫১-৫৩।

১১৪. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নূর, টীকা-৬।

১১৫. তাফসীর কাবীর, ফখরুদ্দীন রাযী, ২৩/১৬১।

১১৬. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নূর, টীকা-৬।

www.bjilibrary.com

অর্থাৎ 'গুনাহ্ থেকে তাওবাকারী এমন ব্যক্তির মত হয়ে যায়, যার কোনো গুনাহ্ নেই।' তেমনিভাবে কুফর অপবাদ থেকেও বড়ো অপরাধ, আর কাফির যখন তাওবা করে মুসলিম হয় তখন তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়। অনুরূপভাবে মুসলিম তাওবা করলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁরা আরও দলিল পেশ করেন ঐ ঘটনার বর্ণনা থেকে যা মুগীরা ইবনু শু'বা এর ব্যাপারে ঘটেছিলো। আর তা হলো, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মুগীরা ইবনু শু'বা সম্পর্কে যারা যিনার সাক্ষ্য দিয়েছিলো– তাদেরকে অপবাদের শাস্তি দিয়েছিলেন। আর তারা তিনজন হলেন, আবু বাকরাহ্, নাফী ও নুফাঈ। অতপর উমার (রা) তাদেরকে বলেন, যে ব্যক্তি নিজের মিথ্যাচার স্বীকার করবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। আর যে মিথ্যাচার স্বীকার করবে না আমি তার সাক্ষ্য বৈধ মনে করি না। একথা শুনে নাফী ও নুফাঈ নিজেদের মিথ্যাচার স্বীকার করলেন। তখন উমার (রা) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন। অপরদিকে আবু বাকরাহ্ তার মিথ্যাচার স্বীকার না করার কারণে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবীদের কেউ আপত্তি করেননি।[১১৭]

কোনো কোনো বর্ণনায় একথা বলা হয়েছে– হদ্ প্রয়োগ করার পর উমার (রা) আবু বাকরাহ্ ও তার দু'সাথীকে বলেন, যদি তোমরা তাওবা করে নাও (অথবা নিজেদের মিথ্যাচার স্বীকার করে নাও) তাহলে আমি আগামীতে তোমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেবো। অন্যথায় তা গ্রহণ করা হবে না। সাথী দু'জন স্বীকার করে নেয় কিন্তু আবু বাকরাহ্ নিজের কথায় অনড় থাকেন।

বাহ্যত এটি একটি বড়ো শক্তিশালী সমর্থন মনে হয়। কিন্তু মুগীরা ইবনু শু'বার মামলার যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায় এ নজীরের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শন করা ঠিক নয়। সেখানে মূল কাজটি ছিলো সর্ববাদীসম্মত এবং স্বয়ং মুগীরা ইবনু শু'বাও এটি অস্বীকার করেননি। মহিলাটি কে ছিলো এই নিয়েই বেধেছিলো বিরোধ। মুগীরা (রা) বলেছিলেন, তিনি তার স্ত্রী, যাকে এরা উম্মু জামীল মনে করেছিলো। সেই সাথে একথাও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো, মুগীরার স্ত্রী ও উম্মু জামীলের চেহারার এতটা সাদৃশ্য ছিলো যে, ঘটনাটি যে পরিমাণ আলোয় যতটা দূর থেকে দেখা গেছে তাতে মেয়েটিকে উম্মু জামীল মনে করার মত ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু আন্দাজ-অনুমান সবকিছু ছিলো মুগীরার পক্ষে। বাদীপক্ষের একজন সাক্ষীও একথা স্বীকার

১১৭. আহকামুল কুরআন, আবু বকর ইবনুল আরাবী, ৩/১৩২৫।

www.bjilibrary.com

করেছিলেন, মহিলাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো না। এই কারণে উমার (রা) মুগীরার পক্ষে রায় দেন এবং উপরে উল্লেখিত হাদীসে যে কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে আবু বাকরাহকে শাস্তি দেবার পর উমার (রা) তাকে সেগুলো বলেন। উমার (রা) এর উদ্দেশ্য ছিলো একথা বুঝানো যে, তোমরা অযথা একটি কুধারণা পোষণ করেছিলে একথা মেনে নাও এবং ভবিষ্যতে আর কখনও এ ধরনের কুধারণার ভিত্তিতে লোকদের বিরুদ্ধে অপবাদ না দেবার প্রতিশ্রুতি দাও। অন্যথায় ভবিষ্যতে তোমাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না। এ থেকে এ সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না যে, সুস্পষ্ট মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার পরও কোনো ব্যক্তি যদি তাওবা করে তাহলে উমার (রা) এর মতে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আসলে এ বিষয়ে প্রথম দলের মতই বেশি শক্তিশালী মনে হয়। মানুষের তাওবার অবস্থা অবশ্যই আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের সামনে যে ব্যক্তি তাওবা করবে আমরা তাকে বড়ো জোর ফাসিক বলবো না। এতটুকু সুবিধা আমরা তাকে দিতে পারি। কিন্তু যার মুখের কথার ওপর আস্থা একবার নষ্ট হয়ে গেছে সে কেবল আমাদের সামনে তাওবা করেছে বলে তার মুখের কথাকে আবার দাম দিতে থাকবো, এত বেশি সুবিধা তাকে দেয়া যেতে পারে না। এছাড়া আলকুরআনের আয়াতের বর্ণনাভঙ্গিও একথাই বলছে– إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا (তবে যারা তাওবা করেছে) এর সম্পর্ক শুধু أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (তারাই ফাসিক) এর সাথেই রয়েছে। তাই এ বাক্যের মধ্যে প্রথম দুটো কথা বলা হয়েছে শুধু নির্দেশমূলক শব্দের মাধ্যমে। অর্থাৎ 'তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর' 'এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করো না' আর তৃতীয় কথাটি বলা হয়েছে খবর পরিবেশন করার স্টাইলে। অর্থাৎ– 'তারা নিজেরাই ফাসিক।' এই তৃতীয় কথাটির পরে সাথে সাথেই 'তারা ছাড়া যারা তাওবা করে নিয়েছে' একথা বলায় প্রমাণ হয়ে যায় যে, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষের খবর পরিবেশন সংক্রান্ত বাক্যাংশটির সাথে সম্পর্কিত। পূর্বের দুটো নির্দেশমূলক বাক্যাংশের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। তবু যদি একথা মেনে নেয়া হয়, এ ব্যতিক্রমের ব্যাপারটি শেষ বাক্যাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়, তাহলে এরপর বুঝে আসেনা, তা– 'সাক্ষ্য গ্রহণ করো না' বাক্যাংশ পর্যন্ত এসে থেমে গেল কেন, 'আশি বেত্রাঘাত কর' বাক্যাংশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল না কেন? [১১৮]

---

১১৮. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নূর, টীকা-৬।

www.bjilibrary.com

আরও একটি ব্যাপার লক্ষণীয় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ابدا বা 'চিরদিনের জন্য' শব্দের ব্যবহার প্রমাণ করে যে, সাক্ষ্য সদাসর্বদা চিরদিনের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। যদিও সে তাওবা করে। আর তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া আলকুরআনের ভাষ্যের পরিপন্থী। ফী যিলালিল কুরআনে বলা হয়েছে–

المسلمون عدول بعضهم على بعض الا محدودا فى قذف.

'মুসলিমগণ একে অপরের জন্য ন্যায়পরায়ণ, শুধুমাত্র অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া।'[১১৯]

২০. চুরি কিংবা ব্যভিচারের দায়ে শাস্তি ভোগকারী সংশোধিত হলে তার সাক্ষ্য

ব্যভিচারের দায়ে শাস্তি ভোগকারী শাস্তি ভোগের পর যদি সংশোধিত হয়ে যায় এবং সৎভাবে জীবন যাপন করে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তেমনিভাবে চোর বা মাদকসেবী যদি শাস্তি ভোগ করার পর সংশোধিত হয়ে যায় তাহলে তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য। এই বিষয়ে ফকীহ্গণ একমত।[১২০]

২১. ব্যভিচার জাত (জারজ) ব্যক্তির সাক্ষ্য

ব্যভিচার জাত ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ তার জন্মদাতা ও জন্মদাত্রীর পাপাচারের জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না। যেমন কোনো মুসলিম ব্যক্তির পিতামাতা কাফির হলেও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১২১]

২২. সাহাবী, তাবিঈ ও সালাফে সালেহীনকে গালমন্দকারীর সাক্ষ্য

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাহাবী, তাবিঈ এবং মুজতাহিদ ফকীহ্ ও ইমামগণকে যারা গালিগালাজ করে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১২২]

২৩. ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য

উপযুক্ত সাক্ষী না পাওয়া গেলে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১২৩] হানাফী

১১৯. ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কুতুব, ১৮/৬২, ৬৩।

১২০. আলমগীরী, ৩/৪৬৮। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ২৬৫।

১২১. হিদায়া, ৩/১৪৮। বাদাইউস সানায়ী, ৬/২৬৯। আলমগীরী, ৩/৪৬৯।

১২২. আলমগীরী, ৩/৪৬৮। হিদায়া, ৩/১৪৭।

১২৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৮৭।

www.bjilibrary.com

ফকীহ্গণের অধিকাংশের মতে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিচারক ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায় প্রদান করলে তা কার্যকর হবে।[১২৪]

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, ফাসিক ব্যক্তি সমাজে মর্যাদাবান, ভদ্র ও বদান্য হিসেবে জনপ্রিয় হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। কারণ সে তার ব্যক্তিত্ব, মর্যাদা ও বদান্যতার কথা বিবেচনা করে কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান হতে বিরত থাকবে।[১২৫] তাছাড়া কালের প্রবাহে ক্রমান্বয়ে মানুষের নৈতিক মান নিম্নগামী হয়েছে। সুতরাং সাধারণভাবে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করলে বহু বিষয় প্রমাণ করা সম্ভব হবে না।[১২৬] এজন্য আধুনিক গবেষক আলিমদের মতে ফাসিক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

২৪. সরকারী পদে নিয়োজিত ব্যক্তির সাক্ষ্য

সরকারী পদে নিয়োজিত বা কর্মরত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। যদি তিনি অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী না হন।[১২৭]

২৫. কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি, সুদখোর, ফরয বিধান ত্যাগকারী ও মিথ্যাবাদীর (প্রতারকের) সাক্ষ্য

সুদখোর এবং হারাম জিনিস ভক্ষণকারী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তির সাক্ষ্য, ফরয বিধান লঙ্ঘন করা কবীরাহ্ গুনাহ্, তাই কবীরাহ্ গুনাহ্য় লিপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও প্রতারক হিসেবে সমাজে কুখ্যাত তার সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এসব ব্যক্তি যদি তাওবা করে এবং নিজেকে শুধরে নেয় তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১২৮]

২৬. সাক্ষীর সংখ্যা

প্রচলিত আইনে কোনো বিষয় প্রমাণের জন্য সাক্ষীর সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই।[১২৯] কিন্তু

---

১২৪. প্রাগুক্ত, পৃ-২৭৯। আল ফিক্হুল ইসলামী-৬/৫৬৪।

১২৫. প্রাগুক্ত।

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪, ২৬৫।

১২৮. আলমগীরী, ৩/৪৬৭। বাদাইউস সানায়ি, ৬/২৬৯। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ২৬৩, ২৬৪।

১২৯. সাক্ষ্য আইন, এ,টি,এম কামরুল ইসলাম ও মুহাম্মদ সাইফুল আলম, পৃ. ৫৮ খোশরোজ কিতাব মহল কর্তৃক প্রকাশিত।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আইনে কোনো ঘটনা প্রমাণের জন্য কমপক্ষে দু'জন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন। তবে ব্যভিচারের বিচারের জন্য চারজন পুরুষ সাক্ষী হতে হবে। অন্যান্য বিচারের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ সাক্ষী দু'জন না পাওয়া যায় তাহলে একজন পুরুষ সাক্ষীর সাথে দু'জন মহিলা সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। তবে যেসব বিষয় মহিলাদের সাথে সংশ্লিষ্ট সেসব ক্ষেত্রে ন্যূনতম দু'জন মহিলা সাক্ষী হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে। অবশ্য নিদেন পক্ষে এক্ষেত্রে একজন মহিলার সাক্ষ্যও অবস্থার প্রেক্ষিতে গ্রহণ করা হবে।[১৩০]

২৭. সাক্ষ্য দানের পদ্ধতি

ক. সাক্ষীগণ আদালতে হাজির হয়ে বাদী ও বিবাদীর উপস্থিতিতে তারা কোন্ পক্ষের অনুকূলে সাক্ষ্য দেবেন তা বলবেন এবং তাদের পরিচয় জানাবেন।

খ. শুনানীর দিন বাদী ও বিবাদী আদালতে হাজির থাকলে বাদী তার সাক্ষীদের পরিচয় দেবেন ও পর্যায়ক্রম নির্দেশ করবেন এবং সেই পরিচিতি ও পর্যায়ক্রমানুসারে আদালত সাক্ষীদেরকে সাক্ষ্য প্রদান করতে আহ্বান জানাবে।

গ. বাদী বা বিবাদী অনুপস্থিত থাকলে অথবা মারা গেলে এবং তাদের প্রতিনিধি (উকিল বা ওসী) উপস্থিত থাকলে সেক্ষেত্রেও বাদী এবং বিবাদীর নাম উল্লেখ করে সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে।

ঘ. বিবদমান বিষয় জীবজন্তু হলে সাক্ষ্য প্রদানকালে সেটির পূর্ণ পরিচয় দিতে হবে।

ঙ. বিবদমান বিষয় জায়গাজমি ও বাড়িঘর হলে তার চতুঃসীমা বা চৌহদ্দির বর্ণনা দিতে হবে।

চ. মৃতের ওয়ারিসের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মৃতের সাথে ওয়ারিশের কি ধরনের সম্পর্ক তা সাক্ষীদেরকে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করতে হবে।[১৩১]

২৮. সাক্ষীদের বক্তব্যে পার্থক্য

ক. ঘটনার মূল বিবরণে সাক্ষীদের বক্তব্যের মধ্যে শব্দগত মিল না থাকলেও তাৎপর্যগত মিল থাকলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কোনো মাল

---

১৩০. মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা ও মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাকের রেফারেন্সে হিদায়া ৩/১৩৯, ফাতওয়া আলমগীরি, ৩/৪৬৫।

১৩১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ইসলামী আইন বিধিবদ্ধকরণ বোর্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধারা-৫৮৫।

www.bjilibrary.com

বাদীকে হেবা করা হয়েছে বলে একজন সাক্ষ্য দিলেন। অপরজন বললেন, উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে।

খ. বাদী যে পরিমাণ ঋণের দাবী করেছে একজন সাক্ষী সেই পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণের সাক্ষ্য প্রদান করলে আর অপরজন তার চেয়ে কম পরিমাণের সাক্ষ্য প্রদান করলে কম পরিমাণের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

গ. কোনো বস্তুর পরিমাণ নিয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মত বিরোধ হলে, যে পরিমাণের ওপর সাক্ষীদের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই পরিমাণের ওপর তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ঘ. কোনো জিনিসের প্রজাতি নিয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতানৈক্য হলে তাদের (কারও) সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না।

ঙ. বাদী বিবাদীর কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওনার দাবী করলে এবং সাক্ষীদের পাওনার পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের সাথে সাথে বিবাদী তা পরিশোধ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলে বাদীর দাবীকৃত সম্পূর্ণ পাওনার পক্ষে সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

চ. ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন বলে দাবী করলেন। একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলেন ঋণদাতা তার ঋণ ফেরত পেয়েছেন। আরেক সাক্ষী বললেন, ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে দায়মুক্ত করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় কারও সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৩২]

২৯. আদালত কর্তৃক সাক্ষীর যোগ্যতা বিবেচনা

বাদী কিংবা বিবাদীপক্ষ সাক্ষীগণের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করুক বা না করুক, আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে, সাক্ষীগণ সাক্ষী প্রদানের যোগ্য কিনা।[১৩৩]

কোনো পক্ষ অপর পক্ষের দাবী অস্বীকার করলে এবং সাক্ষীগণের সততা সম্পর্কে প্রশ্ন তুললে আদালত অবশ্যই সাক্ষীগণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবে এবং সেই অনুযায়ী রায় প্রদান করবে।[১৩৪]

সাক্ষীদের যোগ্যতা নিরূপণের জন্য প্রয়োজনে আদালত অনুসন্ধান টীম পাঠাবে। যে টীমের প্রত্যেক সদস্যকে মুসলিম, বয়োপ্রাপ্ত, বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ হতে

১৩২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ধারা-৫৮৯।

১৩৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৮৩।

১৩৪. প্রাগুক্ত, ধারা-৫৮৪।

www.bjilibrary.com

হবে। অনুসন্ধানকারী পুরুষ হওয়া জরুরী নয় মহিলাদেরও অনুসন্ধান কাজে নিয়োগ করা যেতে পারে।

অনুসন্ধানকারী টীম প্রথমে গোপনে অনুসন্ধান করবে, সাক্ষী ন্যায়পরায়ণ প্রমাণিত হলে অতপর প্রকাশ্যে তারা খোঁজখবর নেবে।

সাক্ষীগণ ন্যায়পরায়ণ ও সাক্ষ্যদানের যোগ্য কিনা তা অনুসন্ধানকারী টীম সুস্পষ্টভাবে আদালতকে জানাবে।[১৩৫]

৩০. একপক্ষের সাক্ষ্য অপরপক্ষের সাক্ষ্যের মাধ্যমে খণ্ডন

একপক্ষ যদি অপরপক্ষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য উপস্থাপন করে এবং অপরপক্ষের সাক্ষীগণ তা মিথ্যা প্রমাণিত করে তাহলে প্রথম পক্ষের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।[১৩৬] যেমন একপক্ষের সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিলেন, প্রতিপক্ষের ব্যক্তি অমুক দিন অমুক সময়ে অমুক কাজটি করেছেন। অপরপক্ষের সাক্ষীগণ বললেন, অমুক দিন অমুক সময়ে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না কিংবা সেদিন এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। তাহলে আগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য খণ্ডন হয়ে যাবে।

৩১. সাক্ষীদেরকে জেরা

সাক্ষীদের বক্তব্য যথার্থ কিনা সে সম্পর্কে বিচারক তাদের জেরা করে নিশ্চিত হবেন।

সাক্ষীদেরকে বাদী ও বিবাদী উভয়েরই জেরা করার অধিকার রয়েছে।[১৩৭]

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবা কিরামের সময় থেকেই জেরা করার এ নীতি চলে আসছে। এক ব্যক্তি ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে এভাবে জেরা করেন– তুমি সম্ভবত চুমো দিয়েছো; জড়াজড়ি করেছো, কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়েছো। তুমি কি তার সাথে সঙ্গম করেছো? তুমি কি জানো ব্যভিচার কী? সম্ভবত তুমি অবিবাহিত, তুমি বোধ হয় মাতাল অবস্থায় ছিলে। তোমার সেই অঙ্গ কি তার সেই অঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো? তা কি সেভাবে প্রবেশ করেছিলো, যেভাবে সুরমাদানীর মধ্যে সুরমা শলাকা প্রবেশ করে কিংবা পানি তোলার রশি কূপের মধ্যে প্রবেশ করে?

---

১৩৫. প্রাগুক্ত, ধারা-৫৯২। বাদাইউস সানায়ী, ৭/১০, তাযকিরাতুশ শুহুদ অধ্যায়।

১৩৬. প্রাগুক্ত, ধারা-৫৯০।

১৩৭. প্রাগুক্ত, ধারা-৫৯১।

www.bjilibrary.com

অতপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্থানীয় লোকদের কাছে প্রশ্ন করেন, লোকটি পাগল নয় তো?[১৩৮] এখানে উল্লেখ্য যে, স্বীকারোক্তিও এক ধরনের সাক্ষ্য অর্থাৎ ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য।[১৩৯]

৩২. বিভিন্ন আইন ও দণ্ডবিধিতে সাক্ষ্য আইনের প্রয়োগ

এতক্ষণ আমরা সাক্ষ্য আইনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করলাম। এবার আমরা আলোচনা করবো বিভিন্ন আইন ও দণ্ডবিধিতে সাক্ষ্য আইনের প্রয়োগ প্রসঙ্গে।

(১) বিয়ের সাক্ষ্য :

বিয়ে শুদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে দু'জন বালিগ বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ অথবা একজন বালিগ বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ এবং দু'জন প্রাপ্তবয়স্কা বুদ্ধিমতি মুসলিম মহিলা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকা।[১৪০]

আলী (রা) বলেছেন, 'সাক্ষী ছাড়া কোনো বিয়ে বৈধ নয়। আর বিয়েতে মহিলা সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।[১৪১]

উমার (রা) বলেছেন, 'ওলী এবং দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।[১৪২] তাঁর মতে একজন পুরুষের সাথে দু'জন মহিলা কিংবা শুধু মহিলাদের সাক্ষীতেও বিয়ে বৈধ। উমার (রা) এর কাছে এক গর্ভবতী মহিলাকে হাজির করা হয়েছিলো। তার বক্তব্য ছিলো– অমুক ব্যক্তি আমাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার মা এবং বোনকে সাক্ষী রেখে তোমাকে বিয়ে করলাম।' উমার (রা) সেই মহিলার ওপর হদ প্রয়োগ করেননি। কিন্তু তাদের বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে উভয়কে পৃথক করে দেন এবং বলেন অভিভাবক ছাড়া বিয়ে নেই।[১৪৩] এই মামলায় তিনি মহিলাদের সাক্ষ্য বাতিল করেননি, তিনি অভিভাবক (ওলী) ছাড়া বিয়েতে আপত্তি করেছেন।

তবে এ ঘটনাটি উমার (রা) এর একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। আর কোনো সাহাবী থেকে এরূপ কাজের সমর্থন পাওয়া যায় না। কারণ উমার (রা) মহিলাদের সাক্ষ্য

---

১৩৮. তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন্ নূর, টীকা-২।

১৩৯. বাদাইউস সানায়ী, ৭/১০, তাযকিরাতুশ শুহুদ অধ্যায়।

১৪০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-২৬৬।

১৪১. সুনানু আল বাইহাকী, ৭/১১১। আল্ মুগনী, ৬/২৫০।

১৪২. আল মুগনী, ৬/৬৪১।

১৪৩. মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ১/২০৭।

www.bjilibrary.com

গ্রহণযোগ্য হবার শর্তারোপ করেছেন, একজন পুরুষের পরিবর্তে দু'জন মহিলাকে সাক্ষ্য দিতে হবে।[১৪৪]

(২) তালাকের সাক্ষ্য

তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নয়।[১৪৫] আল কুরআনে যদিও তালাকের সাক্ষী সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'তাদের ইদ্দত পূরণের সময় আসন্ন হলে তোমরা হয় তাদেরকে সসম্মানে রেখে দেবে অথবা সসম্মানে ত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখবে।'[১৪৬] কিন্তু ফকীহ্গণের মতে তালাকদানের ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক নয়। মুস্তাহাব।[১৪৭]

(৩) ব্যভিচার (যিনা) এর সাক্ষ্য

ব্যভিচারের শাস্তি প্রদানের অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে– সাক্ষীগণ কর্তৃক সাক্ষ্য প্রদান করা। ব্যভিচারের মামলায় চারজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৪৮] ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্যের প্রয়োজন, ব্যভিচার পুরুষের হোক কিংবা মহিলার।[১৪৯] বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনে বলা হয়েছে– চারজন বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ স্বচক্ষে অপরাধীদ্বয়কে তাদের একজনের প্রজনন অঙ্গ অপরজনের প্রজনন অঙ্গে প্রবিষ্ট করিয়ে যৌনকার্য করতে দেখেছে বলে সাক্ষ্য প্রদান করবে।[১৫০]

ব্যভিচার প্রমাণের জন্য ন্যূনতম চারজন সাক্ষী প্রয়োজন। সাক্ষী চারজনের কম হলে ব্যভিচার প্রমাণিত হবে না। এ সম্পর্কে উম্মাতের সকল যুগের ফকীহ্দের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন– 'আর যারা

---

১৪৪. আল মুহাল্লা, ৯/৩৯৯।

১৪৫. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৩৪৪।

১৪৬. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. (سورة طلاق : ٢١)

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

১৪৮. ইসলামী ফৌজদারী আইন, পৃ. ০৭।

১৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১৫০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-১৩৩।

www.bjilibrary.com

অবিবাহিত সতী মহিলাদের অপবাদ দেয়, অতপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তাদেরকে আশি বেত্রাঘাত কর।'[১৫১]

সাক্ষীদেরকে অবশ্যই পুরুষ হতে হবে। তার প্রমাণ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী– 'তোমাদের (পুরুষদের) মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী দাঁড় করাও।'[১৫২] এখানে পুরুষদেরকে বিশেষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। যার নিদর্শন হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী مِنْكُمْ শব্দের সর্বনাম পুংলিঙ্গের শব্দ।[১৫৩]

উমার (রা) বলেছেন, তালাক, বিয়ে, হদ ও কিসাসের বেলায় মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫৪]

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনে বলা হয়েছে– সাক্ষীদের সকলকেই 'পুরুষ' হতে হবে। এ বিষয়ে চার মাযহাবের ফকীহ্গণ একমত। এক্ষেত্রে 'নারীর সাক্ষ্য' গ্রহণযোগ্য নয়। তবে অপরাধী 'মুহসান'[১৫৫] কিনা এই ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।[১৫৬]

অবশ্য আতা ইবনু ইয়াসার (রহ) ও হাম্মাদ (রহ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তারা তিনজন পুরুষের সাথে দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন।[১৫৭] আমর ইবনু হাজম (রহ) বলেছেন, যিনার সাক্ষীর ব্যাপারে দু'জন মুসলিম নারী একজন পুরুষের সমান বলে বিবেচিত হবেন। যেমন তিনজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা

---

১৫১. وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً. (سورة النور : ٤)

১৫২. فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ. (النساء : ١٥)

১৫৩. মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ. ২৮০।

১৫৪. মুসান্নাফ আবদুর রাজ্জাক, ৮/৩৩০। আল মুহাল্লী, ৯/৩৯৭। মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, ২/১৩২। অবশ্য বিয়েতে মহিলাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে উমার (রা) থেকে ভিন্নমতও রয়েছে।

১৫৫. যে বালিগ ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুরুষ ও নারী পরস্পর সহীহ্ বিয়ে অনুষ্ঠানের পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনের স্বাদ লাভ করেছে তাকে বা তাদেরকে 'মুহসান' বলে। কোনো ব্যক্তি 'মুহসান' কিনা তা প্রমাণের জন্য দু'জন সাক্ষীই যথেষ্ট। (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-১২৭ (ক), (খ)।

১৫৬. শারহু ফাতহিল কাদীর, ৪/১১৪ এবং আল হিদায়া, ২/৫০৬ এর রেফারেন্সে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৩।

১৫৭. আল মুগনী, ১০/১৭৫।

www.bjilibrary.com

অথবা দু'জন পুরুষ ও চারজন মহিলা অথবা একজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা কিংবা আটজন মহিলা যাদের সাথে পুরুষ সাক্ষী থাকবে না।[১৫৮] অবশ্য চার মাযহাব এর কোনো ইমামই এ মতকে সমর্থন করেননি।

চারজন সাক্ষীর মধ্যে অভিযুক্তার স্বামীও যদি অন্তর্ভুক্ত হন, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১৫৯]

সাক্ষীগণ স্বচক্ষে অপরাধীদ্বয়কে অপরাধ সংঘটিত করতে দেখলেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এই ক্ষেত্রে আরেকজনের কাছে ঘটনা শুনে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৬০]

সাক্ষীদেরকে একই সময়ে আদালতে হাজির হয়ে পরপর সাক্ষ্য দিতে হবে। একজন আজ, দ্বিতীয়জন কাল, এভাবে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী ফকীহ্গণ একমত।[১৬১]

সময়, স্থান ও অপরাধীদের সনাক্ত সম্পর্কে সকল সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এসব বিষয়ে মতভেদের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৬২]

রায় দেয়ার আগে বা পরে এবং হদ কার্যকর করার আগে কোনো সাক্ষীর অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে এবং সাক্ষীদের সংখ্যা চারের কম হয়ে গেলে সকল সাক্ষী ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার দণ্ড ভোগ করবে।

শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর সাক্ষীর অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে বেত্রদণ্ডের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে বাইতুলমাল থেকে 'আরশ'[১৬৩] প্রদান করতে হবে। রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) এর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে বাইতুলমাল থেকে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করতে হবে।

হদ কার্যকর হওয়ার আগে কোনো সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে এবং সাক্ষীদের সংখ্যা চার এর কম হয়ে গেলে সকল সাক্ষী ব্যভিচারের অপবাদ দণ্ড ভোগ করবে।

---

১৫৮. আল মুদাওয়ানা, ১৬/০৮, আল মুহাযযাব, ২/৩৭৪ ইত্যাদি গ্রন্থের রেফারেন্সে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ৩৫৩ ও মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, পৃ. ২৮০।

১৫৯. শারহু ফাতহিল কাদীর, ৪/১১৪।

১৬০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৩।

১৬১. আল মুগনী, ১০/১৭৮, ১৭৯। শারহু ফাতহিল কাদীর, ৪/১২০। বাদাইউস সানায়ী, ৭/৪৮।

১৬২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫৩।

১৬৩. হত্যা ছাড়া মানব দেহের বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিনিময়ে জরিমানাস্বরূপ দেয় সম্পদকে আর্‌শ (ارش) বলা হয়। –ফিক্‌হ আবু বকর (রা)।

www.bjilibrary.com

হদ কার্যকর হওয়ার পর কোনো সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে কেবল সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারী 'ব্যভিচারের অপবাদ দণ্ডে দণ্ডিত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে এক চতুর্থাংশ দিয়াত প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

ঘটনার স্থান, কাল ও অপরাধীদের সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে সাক্ষীগণ দোষী সাব্যস্ত হবেন না। কারণ সাক্ষীর সংখ্যা 'চার' পূর্ণ হয়েছে শুধুমাত্র তাদের সাক্ষ্যের ক্রটির কারণে অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। অনুরূপভাবে অপরাধীদের সনাক্ত করার ক্ষেত্রেও মতভেদ হলে সাক্ষীগণ শাস্তি ভোগ করবে না।

এক বা একাধিক সাক্ষী ধর্ষণের সাক্ষ্য দিলে এবং অবশিষ্ট সাক্ষী স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সাক্ষ্য দিলে সাক্ষীগণ দোষী সাব্যস্ত হবে না।

সাক্ষীর সংখ্যা চার-এর কম হলে সকল সাক্ষী ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার দায়ে শাস্তি ভোগ করবে।

চার-এর অতিরিক্ত সাক্ষ্য থাকলে এবং অতিরিক্ত সাক্ষীগণের সাক্ষ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে কিংবা তাদের কেউ সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে বা কেউ সাক্ষীর অযোগ্য ঘোষিত হলেও যিনা প্রমাণিত হবে।[১৬৪]

যদি ব্যভিচারী দাবী করে, যেই মহিলার সাথে তাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হচ্ছে তিনি তার স্ত্রী। এক্ষেত্রে সেই মহিলা অন্য কারও স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারী হদ এর দণ্ড থেকে রেহাই পাবে। সে সত্যিই অন্য কারও স্ত্রী কিনা সেজন্য সাক্ষ্য তলব করা হবে না।[১৬৫]

সাক্ষীদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলে অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেলে ব্যভিচারের হদ রহিত হয়ে যাবে।[১৬৬]

অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি দু'বার ব্যভিচারের স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সাথে দু'জন সাক্ষীও সাক্ষ্য প্রদান করে, এক্ষেত্রে হদ কার্যকর হবে না।[১৬৭]

চার ব্যক্তি কোনো মহিলার ব্যাপারে ব্যভিচারের সাক্ষ্য দিলো কিন্তু কয়েকজন মহিলা সাক্ষ্য দিলো যে, মেয়েটি কুমারী, এক্ষেত্রেও হদ কার্যকর হবে না।[১৬৮]

---

১৬৪. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-১৫০।
১৬৫. ইসলামী ফৌজদারী আইন, পৃ. ৭২।
১৬৬. প্রাগুক্ত, ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের বরাতে।
১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।
১৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

www.bjilibrary.com

(৪) ব্যভিচারী ও সাক্ষীদের জেরা

যদি চারজন সাক্ষী কোনো ব্যক্তির ব্যভিচারের ব্যাপারে একই বৈঠকে সাক্ষ্য দেয়, তখন বিচারক তাদের প্রশ্ন করবেন– ব্যভিচার কী? কোথায় ব্যভিচার সংঘটিত হয়েছে? সাক্ষীরা যদি ব্যভিচারের যথাযথ পরিচয় দিতে পারে এবং বলে সুরমাদানীতে সুরমা শলাকা যেভাবে প্রবেশ করে ঠিক সেইভাবে আমরা ব্যভিচার সংঘটিত হতে দেখেছি, তখন বিচারক তাদেরকে ব্যভিচারের ধরন সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। সাক্ষীরা এর উত্তর দিলে তাদেরকে ব্যভিচার সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। সাক্ষীরা সময়ের বর্ণনা দেয়ার পরে বিচারক যদি দেখেন সময় তামাদি হয়নি তখন তিনি সাক্ষীদেরকে প্রশ্ন করবেন কার সাথে এবং কোথায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে? সাক্ষীরা এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর বিচারকের দৃষ্টিতে সাক্ষীরা যদি আদ্‌ল (ন্যায়পরায়ণ) হন তখন অভিযুক্তকে প্রশ্ন করা হবে সে 'মুহসান'[১৬৯] কিনা? অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিজেকে মুহসান স্বীকার করেন অথবা সাক্ষীরা তাকে মুহসান হিসেবে সাক্ষ্য দেন তখন বিচারক তাকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড (রজম) এর রায় দেবেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নিজকে 'মুহসান' হিসেবে অস্বীকার করেন কিন্তু সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তখন বিচারক সাক্ষীদেরকে ইহ্‌সান (বা মুহসান এর বৈশিষ্ট্য) সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। যদি তারা ইহ্‌সান সম্পর্কে যথোচিত উত্তর দেন তখন বিচারক ব্যভিচারীর প্রতি পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেবেন। আর ব্যভিচারী যদি নিজেকে 'মুহসান' হিসেবে অস্বীকার করেন এবং সাক্ষীরাও তার 'মুহসান' হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেন তখন ব্যভিচারীকে বেত্রাঘাত করা হবে। যদি বিচারকের কাছে সাক্ষীদের ন্যায়নিষ্ঠতা প্রমাণিত না হয় তখন প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা হবে।[১৭০]

(৫) ব্যভিচারের সাক্ষী না পেলে স্বামী স্ত্রীর একক সাক্ষ্য (লি'আন)

কোনো দম্পত্তি যদি একে অপরের ওপর আস্থা হারান, কিংবা স্বামী যদি স্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করেন কিংবা স্ত্রী যদি স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ করেন তাহলে উভয়কে আদালতে দাঁড়িয়ে নিজের অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্যস্বরূপ শপথ করতে হয়, যাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় লি'আন বলে। লি'আন বিশেষ এক প্রকার সাক্ষ্য। আল কুরআনের বলা হয়েছে–

---

১৬৯. মুহাসান বলা হয় সেই বিবাহিত পুরুষকে যার স্ত্রী বর্তমান আছে এবং তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে শরঈ কোনো বাধা নেই।

১৭০. আল মাবসূত গ্রন্থের রেফারেন্সে ইসলামী ফৌজদারী আইন, পৃ. ৮৬, ৮৭।

www.bjilibrary.com

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتٍ بِاللّٰهِ، إِنَّه لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ. وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهٰدتٍ بِاللّٰهِ، إِنَّه لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ.

'আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সম্পর্কে (ব্যভিচারের) অভিযোগ করে, আর তাদের কাছে নিজেদের ছাড়া আর কোনো সাক্ষী না থাকে, তাহলে তাদের (স্বামী স্ত্রীর) মধ্যে একজন চারবার আল্লাহ্‌র নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে যে, (তার আনীত অভিযোগের ব্যাপারে) সে সত্যবাদী। তারপর পঞ্চমবার বলবে– তার ওপর আল্লাহর লা'নত (অভিসম্পাত) হোক যদি সে মিথ্যেবাদী হয়। আর স্ত্রীলোকটি এইভাবে দায়মুক্ত হতে পারে যে, সে চারবার আল্লাহর নামে 'কসম' খেয়ে সাক্ষ্য দেবে, এই ব্যক্তি (তার আনীত অভিযোগের ব্যাপারে) মিথ্যেবাদী। তারপর পঞ্চমবার বলবে– তার ওপর আল্লাহ্‌র গযব পড়ুক যদি সে (তার আনীত অভিযোগে) সত্যবাদী হয়।[১৭১]

ফলাফল : লি'আন করার পর আদালত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেবে। তারা চাইলেও আর কখনও স্বামী স্ত্রী হতে পারবেন না। অর্থাৎ তাদের মধ্যে আর পুনরায় বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়।

(৬) হত্যার সাক্ষ্য

চারভাবে হত্যার প্রমাণ করা হয়। ১. মৌখিক স্বীকৃতি, ২. সাক্ষ্য, ৩. হলফ বা শপথ, ৪. অবস্থার আলামত-নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে।[১৭২]

ইসলামী আইনবিদগণ যে হত্যায় কিসাস ওয়াজিব হবে তা প্রমাণ করতে সাক্ষ্য অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করেন। হত্যাকারীকে চিহ্নিত করতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য ইমাম আওযায়ী (রহ) ও ইমাম যুহরী ভিন্নমত পোষণ

১৭১. সূরা আন নূর, আয়াত : ৬-৯।

১৭২. আত্ তাশরিঈ আল জিনাঈ আল ইসলামী, ২/৩০১, ৩১৪।

www.bjilibrary.com

করেন। তারা বলেন, হত্যা প্রমাণের জন্য দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রদান করাই যথেষ্ট।[১৭৩] আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন– 'তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে দু'জনের সাক্ষ্য গ্রহণ কর। যদি দু'জন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী, যাদের সাক্ষ্যের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট থাক।'[১৭৪] তারা উভয়ে এ আয়াত দিয়ে যুক্তি পেশ করে বলেন, যে অপরাধ কিসাস ওয়াজিব করে সেই অপরাধ দিয়াতও প্রমাণ করে যা ধনসম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এ বিষয়ে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য যথেষ্ট হবে।

তাদের বক্তব্যের প্রতিউত্তরে বলা যায়, হত্যার শাস্তি কিসাস গ্রহণ করে রক্ত ঝরানো। সাক্ষীর ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলে হদ প্রয়োগ করা যায় না। যেহেতু অন্য আয়াতে সাক্ষীদের জন্য ন্যায়পরায়ণতা শর্ত লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাই তাদের সাক্ষ্য দিয়ে কিসাস নেয়া যাবে। কিন্তু দিয়াতের (রক্তপণের) ব্যাপারে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য হলেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। তাই কিসাসকে দিয়াতের পর্যায়ে কিয়াস করা যায় না।[১৭৫]

কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি এক ব্যক্তি হত্যার সাক্ষ্য দেয় তাহলে অভিযুক্তকে আটক করতে হবে এবং আরও একজন সাক্ষী বা নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। না পাওয়া গেলে তাকে মুক্তি দিতে হবে।[১৭৬]

যদি দু'ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয়, অমুক লোক এক ব্যক্তিকে তরবারি/ছুরি দ্বারা আঘাত করার ফলে সে মারা গেছে, এমতাবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তি থেকে কিসাস গ্রহণ অপরিহার্য হবে।[১৭৭]

সাক্ষীদ্বয় যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, হত্যাকারী বল্লম বা তীর দিয়ে হত্যা করেছে, তা ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে।

---

১৭৩. আল মুগনী, ১২/০২।

১৭৪. وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.

১৭৫. বাদায়ি আস সানায়ি, ৭/২৮৬ এর রেফারেন্সে মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, পৃ. ৩৩০।

১৭৬. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৯৩(গ)

১৭৭. ইসলামী ফৌজদারী আইন, পৃ. ১৬০।

www.bjilibrary.com

আর সাক্ষীরা যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়, ভুলে হত্যা সংঘটিত হয়েছে তাহলে তা 'ভুলক্রমে হত্যা' বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে কিসাসের পরিবর্তে হত্যাকারীর স্বজনদেরকে দিয়াত পরিশোধে বাধ্য করা হবে।

আর যদি সাক্ষীরা সন্দেহে পড়ে যায়, হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়েছে না ভুলে হয়েছে তা বলতে না পারে, তবু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এক্ষেত্রে হত্যাকারী দিয়াত পরিশোধে বাধ্য থাকবে।

একজন সাক্ষী বললো, হত্যা ইচ্ছাকৃত সংঘটিত হয়েছে কিন্তু আরেকজন সাক্ষী বললো হত্যা ভুলে সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে কারও সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

সাক্ষীদের মধ্যে যদি নিহত ব্যক্তির শরীরের ক্ষতস্থান নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তখন তাদের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

সাক্ষীদের মধ্যে যদি হত্যা সংঘটিত হওয়ার সময় ও স্থান সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে কারও সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না।

হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত অস্ত্রের বিষয়ে সাক্ষীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সাক্ষীদের কারও সাক্ষ্যই গ্রহণযোগ্য হবে না।

উভয় সাক্ষী সাক্ষ্য দিলো যে, আমরা জানিনা সে কোন ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে হত্যা করেছে, কিয়াস অনুযায়ী তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তবে আইনানুগ ন্যায়পরায়ণতার দৃষ্টিতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং হত্যাকারীর ওপর দিয়াত বাধ্যতামূলক হবে, কিন্তু তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা যাবে না।

দু'জন সাক্ষ্য দিলো, নিহত ব্যক্তিকে দু'জন লোক হত্যা করেছে। তাদের একজন লাঠি দিয়ে আরেকজন তরবারি দিয়ে। কিন্তু আমরা বলতে পারবো না কে লাঠি দিয়ে হত্যা করেছে আর কে তরবারি দিয়ে। এক্ষেত্রে উভয়ের সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।[১৭৮]

একজন আহত ব্যক্তি বললেন, অমুক ব্যক্তি আমাকে আহত করেছে, অতপর তিনি মারা গেলেন। তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ নিহত ব্যক্তিকে অন্য আরেকজন আহত করেছে বলে সাক্ষ্য দিলো। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

নিহত ব্যক্তির দু'ছেলে। একজন উপস্থিত, আরেকজন অনুপস্থিত। উপস্থিত ছেলে পিতার হত্যা বিষয়ে সাক্ষ্য হাজির করলো, এক্ষেত্রে তার সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু অনুপস্থিত ছেলে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তার সম্মতি ছাড়া কিসাস কার্যকর করা যাবে না। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে পুনরায়

---

১৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২, ১৬৩, ১৬৪।

www.bjilibrary.com

সাক্ষী তলব করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য তলবের প্রয়োজনীয়তা নেই। একথার ওপরই হানাফী মাযহাবের ফাতওয়া।

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ দু'ব্যক্তির ওপর হত্যা-অভিযোগ আরোপ করলো। যাদের একজন উপস্থিত, অন্যজন অনুপস্থিত। সাক্ষীগণ উভয়কে হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করলো। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত যিনি উপস্থিত তার সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাকে কিসাস-এর দণ্ড প্রদান করা যাবে। কিন্তু যিনি অনুপস্থিত, তিনি যদি উপস্থিত হয়ে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেন তখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদেরকে পুনরায় তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষী হাজির করতে হবে।[১৭৯]

হত্যাকারী যদি এই মর্মে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করে যে, নিহতের অনুপস্থিত ওয়ারিশ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে, এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয়ের সাক্ষ্য শুনানীযোগ্য হবে এবং ক্ষমা প্রমাণিত হলে কিসাস[১৮০] রহিত হয়ে যাবে। তবে যে সকল ওয়ারিশ তাকে ক্ষমা করেনি তারা অংশ মত দিয়াত প্রাপ্ত হবে।[১৮১]

কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো, অমুক ব্যক্তি আঘাত করার ফলে সে শয্যাশায়ী হয়ে যাতনা ভোগে মারা গেছে। এক্ষেত্রে আঘাতকারী কিসাসের দণ্ডে দণ্ডিত হবে।[১৮২]

সাক্ষীগণ সাক্ষ্য দিলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা সংঘটিত হয়েছে। ফলে হত্যাকারী কিসাসের দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো। পরে সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নিলো। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের ওপর দিয়াত (রক্তপণ) কার্যকর হবে। অর্থাৎ দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে যে ব্যক্তি নিহত হলো তার ওয়ারিশদেরকে সাক্ষীদ্বয় রক্তমূল্য প্রদান করবে।

নিহত ব্যক্তির ভাই হত্যার বিচার দাবী করলো এবং সাক্ষ্য দিলো নিহত ব্যক্তির আর কোনো ওয়ারিশ নেই। কিন্তু হত্যাকারী বললো, নিহত ব্যক্তির একটি ছেলে আছে। এক্ষেত্রে বিচারক বিচারকার্য মুলতবী রাখবেন এবং হত্যাকারীর বক্তব্য যাচাই করে দেখবেন।

দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো, 'ক' ভুলে 'খ' কে হত্যা করেছে। বিচারে হত্যাকারী

---

১৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।

১৮০. হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করাকে ইসলামী আইনে কিসাস বলা হয়। আর হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করে নির্দিষ্ট জরিমানা ধার্য করাকে দিয়াত বলা হয়।

১৮১. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৯৫।

১৮২. প্রাগুক্ত, ধারা-৫৯৬।

www.bjilibrary.com

'ক'-এর কাছ থেকে নিহত ব্যক্তি 'খ' এর দিয়াত (রক্তপণ) নিয়ে দেয়া হলো তার স্বজনদের। কিছুদিন পর দেখা গেল 'খ' জীবিত ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে হত্যাকারীর স্বজনরা তাদের দেয়া রক্তপণ সাক্ষীদ্বয়ের কাছ থেকে কিংবা কথিত নিহিত ব্যক্তি 'খ' এর ওয়ারিশদের থেকে ফিরিয়ে নিতে পারবে।

সাক্ষীদ্বয় যদি ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় এবং হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড (কিসাস) দেয়া হয়, কিছুদিন পর সে জীবিত উপস্থিত হয় সেক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে ভুলে হত্যা করার শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর জীবিত ফিরে এলে যে বিধান (ওপরে বর্ণিত) এখানেও সেই বিধান কার্যকর হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে কিসাস স্বরূপ যাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিলো– তার ওয়ারিশগণ তার রক্তপণ (দিয়াত) তথাকথিত নিহত ব্যক্তি যে জীবিত উপস্থিত হয়েছে তার ওয়ারিশদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে। অথবা যে দু'জনের সাক্ষীতে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে তাদের থেকে আদায় করবে। যদি সাক্ষীদের থেকে রক্তপণ নেয়া হয় তাহলে সাক্ষীগণ কথিত নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশদের কাছে তা দাবী করতে পারবে না।[১৮৩]

সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিলো যে, 'বশির'কে হত্যা করার কথা কলিম স্বীকার করেছে। ফলে 'কলিম'কে মৃতুদণ্ড দেয়া হলো। পরে দেখা গেল 'বশির' জীবিত ফিরে এসেছে। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের ওপর ক্ষতিপূরণ আরোপিত হবে না। বরং কলিম (যে বশির এর হত্যার কথা স্বীকার করেছে) এর ওয়ারিশদের ওপর আরোপিত হবে।[১৮৪]

নিহত ব্যক্তির দুই ছেলে। বড়ো ছেলে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করলো, ছোট ছেলে তার পিতাকে হত্যা করেছে। আর ছোট ছেলে সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করলো– অন্য এক ব্যক্তি তার পিতাকে হত্যা করেছে। এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে বড়ো ছেলে ছোট ছেলের কাছ থেকে অর্ধেক রক্তপণ নেবে। আর ছোট ছেলে তার দাবীকৃত হত্যাকারীর কাছ থেকে অর্ধেক রক্তপণ নেবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ এর মতে বড়ো ছেলের সাক্ষীগণ যদি ছোট ছেলের সম্পর্কে ভুলক্রমে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয়, সেক্ষেত্রে তার ওপর রক্তপণ (দিয়াত) পরিশোধের রায় হবে। আর যদি সাক্ষীদ্বয় হত্যাকাণ্ড ইচ্ছাকৃত ঘটানো হয়েছে বলে সাক্ষ্য দেয় তাহলে ছোট ছেলেকে কিসাসস্বরূপ মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে।

---

১৮৩. ইসলামী ফৌজদারী আইন, পৃ. ১৬৬।

১৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

www.bjilibrary.com

আর যদি উভয় ছেলে পরস্পরের ওপর হত্যার অভিযোগ আরোপ করে এবং স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য উপস্থাপন করে এক্ষেত্রে প্রত্যেক ছেলের ওপর অর্ধেক রক্তপণ আরোপিত হবে। যা একে অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করবে।[১৮৫]

নিহত ব্যক্তির দুই ছেলে। তারা পরস্পরকে পিতার হত্যাকারী দাবী করলো। নিহত ব্যক্তির ভাই সাক্ষ্য দিলো, তারা উভয়েই পিতাকে হত্যা করেছে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে ভাইয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।[১৮৬]

নিহত ব্যক্তির দুই ছেলে। এক ছেলে সাক্ষ্য দিলো 'ক' আমার পিতাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। দ্বিতীয় ছেলে সাক্ষ্য দিলো 'ক' এর সাথে হত্যাকাণ্ডে 'খ'ও ছিলো। এমতাবস্থায় 'ক' এবং 'খ' কারও ওপর কিসাস হিসেবে মৃত্যুদণ্ড হবে না। প্রথম ছেলে যে ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে সাক্ষ্য দিয়েছে তার ওপর অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) আরোপিত হবে। কারণ খুনী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রয়োজন। অভিযুক্ত প্রথম ব্যক্তিকে উভয় ছেলেই হত্যাকারী বলে সাক্ষ্য দিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তিকে হত্যাকারী হিসেবে শুধু এক ছেলে সাক্ষ্য দিয়েছে।

নিহত ব্যক্তির দুই ছেলে। একজন সাক্ষ্য দিলো এই লোক আমার পিতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু অন্য ছেলে অন্য আরেকজন লোককে দেখিয়ে সাক্ষ্য দিলো, এই লোক আমার পিতাকে ভুলে হত্যা করেছে। এক্ষেত্রে হত্যাকারী কারও ওপর কিসাস প্রদান করা যাবে না। শুধু রক্তপণ পরিশোধের দণ্ডাদেশ দেয়া হবে। যা সর্বোচ্চ তিন বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য।[১৮৭]

নিহত ব্যক্তির এক ছেলে ও এক ভাই। তারা পরস্পরকে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী দাবী করলো। এক্ষেত্রে ভাইয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। অনুরূপভাবে যদি নিহত ব্যক্তির দুই ছেলে পরস্পরকে পিতার হত্যাকারী দাবী করে এবং নিহত ব্যক্তির ভাই এক ছেলের পক্ষ নিয়ে তার দাবী সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, এক্ষেত্রে ভাইয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[১৮৮]

(৭) যেসব অবস্থায় হত্যার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়

নিম্নবর্ণিত অবস্থায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাতিল বলে গণ্য হবে।

---

১৮৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

১৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

১৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

১৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।

www.bjilibrary.com

ক. একজন সাক্ষী বললো, ভুলে হত্যা করেছে। আরেকজন বললো ভুলে হত্যা করার কথা স্বীকার করেছে।

খ. একজন সাক্ষী হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত এক ধরনের অস্ত্রের কথা বললো, আরেক সাক্ষী বললো অন্য ধরনের অস্ত্রের কথা।

গ. একজন সাক্ষী এক স্থানে এবং আরেকজন সাক্ষী অন্য স্থানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার সাক্ষ্য দিলে।

ঘ. দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্যে সময়ের ব্যবধান পরিলক্ষিত হলে।

ঙ. একজন সাক্ষী নির্দিষ্ট অস্ত্রের দ্বারা খুন হওয়ার সাক্ষ্য দিলো কিন্তু অপর সাক্ষী কেবল খুন হওয়ার সাক্ষ্য দিলো, কি প্রকারের অস্ত্র দিয়ে খুন হয়েছে তা বলতে না পারলে।

চ. দুই ব্যক্তি পৃথক পৃথক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে খুনের সাক্ষ্য দিলে এবং কি ধরনের অস্ত্র দিয়ে খুন করেছে তা বলতে না পারলে।

ছ. আহত ব্যক্তি যে যখম বা আঘাতের ফলে নিহত হয়েছে সেই যখম বা আঘাত শরীরের কোন্ স্থানে ছিলো তা সাক্ষীদ্বয় বলতে না পারলে।[১৮৯]

(৮) হত্যা প্রমাণের জন্য দু'জন সাক্ষী ও ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী জরুরী হওয়ার কারণ

হত্যার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হওয়া এবং ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী তলব করার হুকুম আল্লাহ্‌র অনন্ত হিকমাত ও কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধান। কেননা, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য হলো হদ্ ও কিসাসের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। হত্যার ব্যাপারে সাবধানতা হলো এই যে, যদি হত্যার ব্যাপারে চারজন সাক্ষী চাওয়া হতো, তাহলে অধিক পরিমাণে খুনখারাবী হতো। হত্যার ব্যাপারে মানুষ দুঃসাহসী হয়ে উঠতো। অধিকাংশ হত্যাকারী কিসাস হতে রক্ষা পেয়ে আরো বেশি খুনখারাবীর কারণ হয়ে দাঁড়াতো।

আর ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সাবধানতা এই যে, ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী চাওয়ার দরুন মুসলিমের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং ব্যভিচার প্রমাণের জন্য এমন চারজন সাক্ষী আবশ্যক করা হয়েছে, যারা ব্যভিচারের প্রত্যক্ষ ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করবে, যাতে সন্দেহ বা সংশয়ের

১৮৯. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৫৯৮।

www.bjilibrary.com

কোনোই অবকাশ না থাকে। এভাবে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির চারবারের কম স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। এতে এ অপমানকর বিষয়টি গোপন রাখার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। কারণ এর প্রকাশ আল্লাহ্‌র নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এ ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কাজটি মুমিনের মধ্যে প্রচারকারীর উপর দুনিয়া ও আখিরাতের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।[১৯০]

(৯) চুরির সাক্ষ্য

চুরির সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য কারও মামলা দায়ের ও তলব থাকতে হবে। যখন সম্পদের মালিক উপস্থিত হয়ে মোকদ্দমা দায়ের করবে, তখন সন্দেহ নিরসন হবে। আর শাস্তি প্রদান অপরিহার্য হবে। অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তি– যার জন্য চুরি যাওয়া সম্পদে নির্ভেজাল মালিকানা রয়েছে তিনিই মোকদ্দমা করবেন। চাই সে মালিকানা প্রকৃত মালিকানা হোক কিংবা অর্পিত মালিকানা হোক কিংবা আমানতের মালিকানা হোক। অতএব সম্পদের মালিক, ধারকৃত সম্পদের মালিক, ব্যবসায় লাভের ভিত্তিতে কারবারের মালিক, আমানতের মালিক, বন্ধককৃত সম্পদের মালিক সবাই মোকদ্দমা দায়েরের অধিকারী।[১৯১]

চুরি প্রমাণ করার জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ সাক্ষী হতে হবে। যাদের মধ্যে সাক্ষ্য প্রদানের সকল শর্তাবলী উপস্থিত থাকবে।[১৯২] বিধিবদ্ধ ইসলামী আইনে বলা হয়েছে– 'চুরি প্রমাণের জন্য যার সম্পদ চুরি করা হয়েছে তাকে ছাড়া কমপক্ষে দু'জন ন্যায়পরায়ণ বালিগ মুসলিম সাক্ষীর প্রয়োজন। সাক্ষী যদি দু'জনের কম হয় অথবা একজন প্রত্যক্ষদর্শী এবং অপরজন শ্রোতাসাক্ষী হয়– তাহলে সেক্ষেত্রে অভিযুক্তকে চুরির শাস্তি দেয়া যাবে না। বরং তা'যীর এর শাস্তি দেয়া হবে।'

যদি চুরি প্রমাণের জন্য সাক্ষী বা স্বীকারোক্তি কোনোটিই না পাওয়া যায় তাহলে শপথের দ্বারা চুরি প্রমাণিত হবে।[১৯৩]

---

১৯০. যুক্তির কষ্টি পাথরে ইসলামের বিধান– মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, অনুবাদ সিরাজুল হক, ইফা কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৪ ঈসায়ী।

১৯১. বাদাইউস সানায়ী, ৭/৮১। দুররুল মুখতার, ৪/৮৬, ৮৭।

১৯২. প্রাগুক্ত।

১৯৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ. ৩৬৭।

www.bjilibrary.com

(১০) চুরি সম্পর্কে ভুল বা মিথ্যা সাক্ষ্যদান

যদি সাক্ষীদ্বয় সাক্ষ্য দিতে ভুল করে, ফলে কারও হাত কেটে দেয়া হয় এবং পরে তারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কর্তিত হাতের জন্য মিথ্যা সাক্ষীদ্বয়কে দিয়াত (রক্তপণ) প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি হাতের বিনিময়ে তাদের উভয়ের হাতকাটা যাবে না।[১৯৪]

(১১) মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য

মাদকসেবীদের চিহ্নিত করার অন্যতম উপায় হচ্ছে সাক্ষ্য। কোনো নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করে, সে মদ পান করেছে কিংবা মাদকদ্রব্য সেবন করেছে, এমতাবস্থায় তার স্বাভাবিক জ্ঞানবুদ্ধি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে দণ্ড প্রদান করা যাবে না।

কারো মুখে মদের গন্ধ পেলেই তাকে শরঈ শাস্তি দেয়া যাবে না। তার স্বীকারোক্তি কিংবা যথাযথ সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতেই কেবল শরঈ দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে।

দু'জন সাক্ষী কারও মদপানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়ার পর, অভিযুক্ত ব্যক্তির মুখ দিয়ে মদের গন্ধ বের হওয়া সত্ত্বেও যদি সময়ের ব্যবধানে সাক্ষীদ্বয়ের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহলে দণ্ডাদেশ বাতিল হয়ে যাবে।[১৯৫]

মাদকদ্রব্য সেবনের বিষয়টি দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। সেবনকারী যদি নিজে স্বীকার করে তবু তা প্রমাণিত হবে। তবে এক্ষেত্রে পুরুষের সাথে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৯৬]

কোন ব্যক্তি মদপান করার পর যদি তাকে ধরে আনা হয়– আর তার মুখে তখনও মদের গন্ধ অবশিষ্ট থাকে অথবা কাউকে যদি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ধরে আনা হয় এবং সাক্ষীগণ তার মদপানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে।

নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অথবা মুখে দুর্গন্ধ থাকাবস্থায় সাক্ষীগণ যদি কাউকে ধরে আনে এবং ঘটনাস্থল থেকে আদালত পর্যন্ত যেতে যেতে তার মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায় তাকেও দণ্ডাদেশ দেয়া হবে।

---

১৯৪. আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ, ৫/১৬৫। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-১৫৫।

১৯৫. ফাতওয়া আলমগীরী-২/১৫৯।

১৯৬. প্রাগুক্ত।

www.bjilibrary.com

(১২) মদপান সংক্রান্ত সাক্ষীগণের জেরা

যদি সাক্ষীগণ বিচারকের কাছে কোনো ব্যক্তির মদপান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়, তখন বিচারক সাক্ষীদের প্রশ্ন করবেন, মদ কী জিনিস? তারপর জিজ্ঞেস করবেন সে কিভাবে তা পান করলো? কেননা হতে পারে তাকে জোর করে পান করানো হয়েছে। আবার প্রশ্ন করবেন, সে কবে পান করেছে? এটাতো অনেক আগের ঘটনাও হতে পারে। যদি সাক্ষীগণ এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে তখন বিচারক অভিযুক্তকে আটক করবেন এবং আরও যাচাই বাছাই করে নিশ্চিত হয়ে তারপর রায় প্রদান করবেন। বাহ্যিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কোনো রায় দেবেন না।[১৯৭]

(১৩) ঋণচুক্তিতে সাক্ষ্য

ঋণচুক্তি অনুষ্ঠানকালে দু'জন মুসলিম ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখতে হবে। সাক্ষী না পাওয়া গেলে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার কাছে তার কোনো মাল বন্ধক রাখবেন। হানাফী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাব মতে ঋণের চুক্তিপত্র লিখিত আকারে হওয়া বাধ্যতামূলক না হলেও অবশ্যই সুন্নাত। কারণ লিখিত চুক্তির দ্বারা বিবাদ, অবিশ্বস্ততা ও প্রতারণাসহ অনেক বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যায়। অবশ্য আল্লামা ইবনু জারীর আত তাবারী (রহ) চুক্তিপত্র লিখিত আকারে হওয়া ফরয বলেছেন।[১৯৮]

এই ব্যাপারে দু'জন মুসলিম পুরুষ সাক্ষী রাখতে হবে। দু'জন পুরুষ সাক্ষী না পাওয়া গেলে একজন পুরুষ ও দু'জন (মুসলিম) মহিলাকে সাক্ষী রাখতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিবাদের সৃষ্টি হলে তা সহজে নিষ্পত্তি করা যায়। ঋণের ক্ষেত্রে সাক্ষীর গুরুত্ব সম্পর্কে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– 'তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করে কিন্তু আল্লাহ্ সেই দু'আ কবুল করেন না... যে ব্যক্তি কাউকে ঋণ দিয়েছে কিন্তু সেই ঋণের সপক্ষে সাক্ষী রাখেনি।[১৯৯]

---

১৯৭. ফাতওয়ায়ে আলমগীরী-২/১৫৯। ইসলামী আইন ও বিচার, পৃ. ৫৮।

১৯৮. আল মাওসুআতুল ফিকহিয়্যা, ২/১২৩।

১৯৯. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ৬১০। আরবী টেক্সট নিম্নরূপ–

ثَلٰثَةٌ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ فَلاَ يَسْتَجِيْبُ لَهُمْ... وَرَجُلٌ لَه عَلٰى رَجُلٍ دَيْنٌ وَلَهُمْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِه -

(احكام القران : ٢/٩٩)

www.bjilibrary.com

৩৩. সাক্ষ্য প্রত্যাহার

আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য ইচ্ছে করলে সাক্ষীগণ প্রত্যাহার করতে পারেন। তারা আদালতে দাঁড়িয়ে বলবেন– 'আমি যে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তা প্রত্যাহার করলাম' অথবা বলবেন– 'আমি আগে যে সাক্ষ্য দিয়েছিলাম তা মিথ্যা' অথবা বলবেন– 'আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছি।' সাক্ষ্য দেয়া কিংবা প্রত্যাহার করা আদালতেই হতে হবে। আদালতের বাইরে সাক্ষ্য প্রত্যাহার গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে সেই আদালত ছাড়া অন্য আদালতে সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলে তাও কার্যকর হবে।[২০০]

আদালত কর্তৃক রায় প্রদানের আগে যদি সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করেন সেজন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ রায় প্রদানের আগে বিবাদীর ওপর কোনোরূপ দায় বর্তায় না। অবশ্য আদালত চাইলে এক্ষেত্রে সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রত্যাহারের প্রকৃতি অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে পারে।[২০১]

আদালত রায় প্রদানের পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে এবং মোকদ্দমা মাল সম্পর্কিত বিষয় হলে সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীকে ক্ষতিপূরণ ('দামান') প্রদান করতে হবে। যেমন দু'ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলেন আবদুর রহিমের কাছে আবদুল জব্বার এক হাজার টাকা পাবেন। আদালত তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আবদুর রহিমের বিরুদ্ধে আবদুল জব্বারকে এক হাজার টাকা প্রদানের ডিক্রি প্রদান করলো। পরে সাক্ষীদ্বয় তাদের সাক্ষী প্রত্যাহার করে বললো, তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আবদুর রহিমের কাছে আবদুল জব্বারের কোনো পাওনা নেই। এক্ষেত্রে সাক্ষীদ্বয় ক্ষতিপূরণস্বরূপ আবদুর রহিমকে এক হাজার টাকা প্রদান করবে, যদি আবদুর রহিম আবদুল জব্বারকে এক হাজার টাকা পরিশোধ করে থাকে। আবদুর রহিম টাকা না দিয়ে থাকলে সাক্ষীগণকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কারণে সাক্ষী প্রত্যাহারকারীগণ আদালতের বিবেচনা অনুযায়ী দণ্ড ভোগ করবে।[২০২]

---

২০০. আলমগীরী, রুজু আনিশ্ শাহাদাহ্ অধ্যায়, ৩য় খণ্ড বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ২৯৫।

২০১. বাদাইউস সানায়ী, ৬/২৮২, (রুজু আনিশ্ শাহাদাহ্)।

২০২. আলমগীরী, ৩য় খণ্ড, রুজু আনিশ শাহাদাহ্। বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ২৯৬।

www.bjilibrary.com

(১) ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রত্যাহার

আদালত কর্তৃক রায় প্রদান ও দণ্ড কার্যকর করার আগে অথবা পরে চারজন সাক্ষীর সকলেই যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে সকলেই কাযাফ (ব্যভিচারের অপবাদ) এর দণ্ড ভোগ করবে।

রায় প্রদানের আগে এক বা একাধিক সাক্ষী সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলেও অবশিষ্ট সাক্ষীদের সংখ্যা যদি চার এর কম হয় তাহলে সকলেই কাযাফ এর দণ্ড ভোগ করবে।

আদালত কর্তৃক ঘোষিত দণ্ড কার্যকর করার পর কোনো সাক্ষী তার সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে কেবল সেই (প্রত্যাহারকারী) কাযাফ এর দণ্ড ভোগ করবে।

আদালত কর্তৃক রজম (পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড) এর রায় ঘোষিত হলে এবং তা কার্যকর করার পর সাক্ষ্য প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটলে সাক্ষীদেরকে (কাযাফ এর দণ্ড ভোগের সাথে সাথে) দিয়াতও (রক্তপণ) প্রদান করতে হবে।[২০৩]

(২) ক্রয়বিক্রয় সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার

কোনো বস্তু প্রকৃত মূল্যে কিংবা অধিক মূল্যে বিক্রি করার সাক্ষ্য প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করা হলে সাক্ষীকে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করার সাক্ষ্য প্রদানের পর তা প্রত্যাহার করা হলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। বিক্রি চূড়ান্তভাবেই হোক কিংবা বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রি প্রত্যাখ্যানের শর্তেই হোক।

কোনো বস্তু তার প্রকৃত মূল্যে অথবা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ক্রয় করার সাক্ষ্য প্রদানের পর পুনরায় তা প্রত্যাহার করা হলে সেজন্য সাক্ষীদের ওপর ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হবে না। অবশ্য অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করার সাক্ষ্য প্রদানের পর সেই সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

ক্রেতা তার ক্রীতবস্তুর মূল্য পরিশোধ করবেন, এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়ার পর সাক্ষীগণ যদি তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় তাহলে সাক্ষীগণ বিক্রেতাকেই সেই মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

ক্রেতা তার ক্রীতবস্তুর মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করবেন এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা হলে বিক্রেতা তৎক্ষণাৎ সাক্ষ্য প্রত্যাহারকারীর কাছ থেকে

২০৩. বাদাইউস সানায়ী এর রেফারেন্সে বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৬০৪।

www.bjilibrary.com

সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করতে পারবেন। চাইলে ক্রেতার কাছ থেকে কিস্তিতেও আদায় করতে পারেন। তবে যে কোনো একজনের কাছ থেকে আদায় করলে অন্যজন দায়মুক্ত হয়ে যাবে।[২০৪]

(৩) ভাড়া সংক্রান্ত সাক্ষ্য প্রত্যাহার

বিচারকের রায় প্রদান ও তা কার্যকর করার পর ভাড়া সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে ক্ষতির সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে সাক্ষীগণ বাধ্য থাকবে।[২০৫]

(৪) ওসিয়াত সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রত্যাহার

কোনো ব্যক্তির পক্ষে আদালতে দু'জন সাক্ষী এই মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করলো যে, মৃত ব্যক্তি তার অনুকূলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করে গেছেন এবং তারা দু'জন সাক্ষী আছে। এর প্রেক্ষিতে বিচারক তার রায় প্রদান ও কার্যকর করার পর সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে এক তৃতীয়াংশ সম্পদের মূল্যমান ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করতে সাক্ষীগণ বাধ্য থাকবে।[২০৬]

(৫) উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রত্যাহার

মিথ্যা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি মৃতের ওয়ারিশ সাব্যস্ত হলে, সাক্ষ্য প্রত্যাহারের পর ওয়ারিশ হিসেবে সে যা গ্রহণ করেছিলো তা প্রকৃত ওয়ারিশদেরকে ফেরত প্রদান করতে হবে।

যেমন– কোনো মহিলাকে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং বিচারকের রায় কার্যকর হওয়ার পর সাক্ষ্য প্রত্যাহার করা হলে সেই মহিলা ওয়ারিশ হিসেবে যা কিছু পেয়েছে তা মৃতের প্রকৃত ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে।[২০৭]

(৬) মূল সাক্ষী ও সাফাই সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রত্যাহার

বিচারকের রায় প্রদান ও তা কার্যকর করার পর মূল সাক্ষীগণ ও সাফাই সাক্ষীগণ একই সাথে তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মূল সাক্ষী কিংবা সাফাই সাক্ষীদের মধ্যে যাদের কাছ থেকে ইচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। কিন্তু উভয় প্রকার সাক্ষীদের কাছ থেকে (একত্রে) ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে না।

---

২০৪. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৬০৫।

২০৫. প্রাগুক্ত, ধারা-৬০৯।

২০৬. প্রাগুক্ত, ধারা-৬০৭।

২০৭. প্রাগুক্ত, ধারা-৬১১।

www.bjilibrary.com

আর যদি শুধু সাফাই সাক্ষীগণ তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ কেবল সাফাই সাক্ষীদের থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে।[২০৮]

৩৪. সাক্ষী না থাকলে বিবাদীকে শপথ করতে হবে

দাবীর অনুকূলে বাদী যদি আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, এক্ষেত্রে বিবাদীকে আদালতে শপথ করে নিজের দায়মুক্তি ঘোষণা করতে হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেছেন– 'সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করার দায়িত্ব বাদীর আর যে বাদীর অভিযোগ অস্বীকার করে সেই বিবাদীর কর্তব্য হচ্ছে শপথ করা।'[২০৯]

বিবাদী তিনবার শপথ করতে অস্বীকার করলে আদালত তার বিরুদ্ধে রায় প্রদান করবে।[২১০]

বিবাদী বালিগ ও সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী হলে এবং বাদীর দাবী (অভিযোগ) প্রত্যাখ্যান করলে, বাদী যদি তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে এবং আদালতে বিবাদীর শপথ দাবী করে এবং তা যদি মানুষের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় তাহলে বিবাদীকে আদালতে শপথ করতে হবে।[২১১]

মাল ও মালের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কেবল এরূপ বিষয় সম্পর্কে শপথ করানো যাবে। একান্তই আল্লাহ্‌র অধিকার এমন বিষয়ে বিবাদীকে শপথ করানো যাবে না। তা হদ সম্পর্কিত হোক অথবা ইবাদাত সম্পর্কিতই হোক। বিয়ে, তালাক প্রত্যাহার, নসব (বংশ পরিচয়), ঈলা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয়েও বিবাদীকে শপথ করানো যাবে না।[২১২]

অর্থাৎ– আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত (হক্কুল্লাহ্‌র) বিষয়ে শপথ করানো বৈধ নয়। এ সম্পর্কে ফকীহ্‌গণ একমত। আল্লাহ্‌র অধিকারভুক্ত হদ সম্পর্কিত বিষয় যেমন– যিনা, চুরি, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি এবং ইবাদাত সংক্রান্ত বিষয় যেমন– নামায,

---

২০৮. প্রাগুক্ত, ধারা-৬১০।

২০৯. اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلى مَنْ اَنْكَرَ. (صحيح مسلم)

২১০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৬১৩।

২১১. প্রাগুক্ত, ধারা-৬১৫।

২১২. প্রাগুক্ত, ধারা-৬১৬, ৬১৭।

www.bjilibrary.com

রোযা, হজ, যাকাত, মানত, কাফফারা ইত্যাদি। কিন্তু এসবের সাথে কোনো ব্যক্তির মাল সম্পদ প্রাপ্য হওয়ার বিষয় সংশ্লিষ্ট হলে সেক্ষেত্রে শপথ করানো যাবে। যেমন সাক্ষ্য প্রমাণে সুস্পষ্টভাবে চুরি প্রমাণিত না হওয়ায় হদ রহিত হয়ে গেল, কিন্তু অপরাধী যে অন্যের মাল ঐ পন্থায় গ্রহণ করেছে সেটি সত্য। এরূপ ক্ষেত্রে বিবাদীকে শপথ করানো যাবে।

বিয়ের ব্যাপারটি এরূপ– কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে নিজের স্ত্রী বলে অথবা কোনো মহিলা কোনো পুরুষকে নিজের স্বামী বলে দাবী করলো। তার দাবীর অনুকূলে সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় যাকে স্বামী বা স্ত্রী বলে দাবী করা হয়েছে সে ঐ দাবী প্রত্যাখ্যান করলে তাকে শপথ করানো যাবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে বিয়ের ক্ষেত্রেও বিবাদীকে শপথ করানো যাবে।

তালাকের বিষয়টি হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রিজঈ তালাক দিলো। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে বললো, তোমার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগেই আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়েছি। স্ত্রী তা অস্বীকার করলো। স্বামীর কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এই অবস্থায় ইমাম আবু হানিফা (রহ) এর মতে স্ত্রীকে শপথ করানো যাবে না। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রহ) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহ) এর মতে স্ত্রীকে শপথ করানো যাবে।

বংশ পরিচয়ের বিষয়টি হচ্ছে– কোনো ব্যক্তি কাউকে নিজের পিতা বা পুত্র বলে দাবী করলো কিন্তু যাকে দাবী করা হয়েছে সে প্রত্যাখ্যান করলো। দাবীদারের কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় সে দাবী প্রত্যাখ্যানকারীকে শপথ করানোর দাবী করলে আবু হানিফা (রহ) এর মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সাহেবাইনের মতে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

ঈলার বিষয়টি এরূপ– স্বামী তালাকের নিয়তে স্ত্রীর সাথে চার মাস পর্যন্ত সহবাস না করার শপথ করলো। চার মাস পর স্বামী স্ত্রীকে বললো তোমার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে শপথ ভঙ্গ করে ফেলেছি। কাজেই তুমি তালাকপ্রাপ্তা হওনি। স্ত্রী অস্বীকার করলো। দাবীর সপক্ষে স্বামীর কাছে সাক্ষ্য প্রমাণ নেই। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে শপথ করানো যাবে না।[২১৩]

২১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮, ৩০৯।

www.bjilibrary.com

৩৫. আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নামে শপথ করা যাবে না

বিবাদী আদালতে কেবল আল্লাহ্‌র নামে শপথ করবেন। বিবাদী মুসলিম বা অমুসলিম যেই হোন না কেন, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নামে শপথ গ্রহণযোগ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নামে শপথ করলো, সে শিরক করলো।' অন্য বর্ণনায় আছে– 'আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কাজেই কেউ যদি শপথ করে সে যেন আল্লাহ্‌র নামেই করে। নতুবা চুপ থাকে।'[২১৪]

৩৬. বিবাদী বিশ্বস্ত না হলেও তার শপথ গ্রহণযোগ্য

সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে অক্ষম বাদী আদালতের কাছে বিবাদী থেকে শপথ নেয়ার দাবী করতে পারেন। এক্ষেত্রে বিবাদী অবিশ্বস্ত হলেও আদালতে তার শপথ গ্রহণযোগ্য। তবে আদালত চাইলে তাকে কঠোর বাক্যে শপথ করাতে পারে।[২১৫]

৩৭. মিথ্যা শপথের দ্বারা হস্তগত সম্পদ হালাল নয়

মিথ্যা শপথ করে বিবাদী মোকদ্দমায় জয়ী হলেও প্রাপ্ত সম্পদ তার জন্য হালাল নয়। হারাম। এজন্য আদালতে আখিরাতে তাকে প্রকৃত বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে কোনো মুসলিমের অধিকার ছিনিয়ে নেয় আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন।' এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি তুচ্ছ কোনো জিনিস হয়?' তিনি বললেন, 'তা পিলু গাছের একটি ডাল হলেও।'[২১৬]

---

২১৪. مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ ـ وَفِىْ رِوَايَة، اِنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ اَنْ تَحْلِفُوْا بِاَبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ اَوْ لِيَصْمُتْ ـ (جامع ترمذى)

২১৫. হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২/১০৮।

২১৬. مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرَأةٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِه فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَه رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ ـ (صحيح مسلم)

www.bjilibrary.com

৩৮. একই জিনিসের দাবীদার দু'জন হলে এবং কারো কাছেই সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকলে

যদি কোনো জিনিসের ব্যাপারে দাবীদার দু'জন হয় এবং স্ব স্ব দাবীর পক্ষে আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে, তাহলে আদালত উভয় পক্ষের সাক্ষ্য প্রমাণ পরীক্ষার সাথে সাথে বস্তুর দখলস্বত্বও বিবেচনা করবে। আর যদি দু'জনের কারও কাছেই উপযুক্ত কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকে তাহলে বস্তুটি উভয়ের মধ্যে আধাআধি ভাগ হবে। অবশ্য ভাগাভাগির পর অংশ নির্দিষ্ট করার জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেন অংশ নির্ধারণে পুনরায় বিবাদ দেখা না দেয়।[২১৭]

৩৯. আলামতের ভিত্তিতে বিচারকার্য পরিচালনা

সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকাবস্থায় কোনো কারণে তা সন্দেহযুক্ত বা বিতর্কিত হলে বিষয়টি পূর্ণভাবে প্রমাণের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত না হলে কিংবা সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান না থাকলে আলামতের ওপর নির্ভর করে বা আলামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিচারকার্য সম্পন্ন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, হদ ও কিসাস এর ক্ষেত্রে শুধু আলামতের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা যাবে না।

আলামত এতটা প্রকাশ্য ও পরিচিত হতে হবে যা আস্থা স্থাপনের ভিত্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে।

আলামতের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিকের মধ্যে ইংগিত সূচক সংযোগ বিদ্যমান থাকতে হবে।

আলামত যদি এতটা শক্তিশালী না হয় এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার অনুকূলে উক্ত আলামত ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে অথবা উক্ত আলামতের বিপরীতে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে, তাহলে সেই আলামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিচারকার্য সম্পন্ন করা যাবে।[২১৮]

ব্যাখ্যা

কোনো কোনো সময় আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকলেও কোনো কারণে তা অস্পষ্ট, সন্দেহযুক্ত বা অন্য কোনো দোষদুষ্ট হতে পারে। যেমন পিতার

---

২১৭. মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, শরহুস সুন্নাহ্ এবং সুনানু আবী দাউদের রেফারেন্সে হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, ২/১১০, ১১১।

২১৮. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ধারা-৬০০।

www.bjilibrary.com

মোকদ্দমায় পুত্রের সাক্ষ্য, বিবাদীর শত্রুর সাক্ষ্য, মক্কেলের অনুকূলে উকিলের সাক্ষ্য যথার্থ হলেও তা পক্ষপাতদুষ্ট ও সন্দেহযুক্ত হতে পারে। অথবা ঘটনার অনুকূলে কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান নেই, এমতাবস্থায় ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট আলামতের ওপর ভিত্তি করে বিচারকার্য সম্পন্ন করা বৈধ। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁর সাহাবীগণ, খুলাফায়ে রাশেদীন ও পরবর্তী কালের মুসলিমগণ আলামতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে মোকদ্দমার রায় দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এক মহিলা ব্যভিচারের ফলে গর্ভবতী হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি করলে তার স্বীকারোক্তির সাথে তার অন্ত:সত্তাকে আলামত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আলামত দেখে কোনো ব্যক্তিকে মুমিন অথবা মুনাফিক বলে চিহ্নিত করার বিষয়টি শরীআহ্ স্বীকৃত। রাস্তায় পড়ে থাকা একটি টাকার থলে পাওয়া গেল। এক লোক উপস্থিত হয়ে থলে, টাকার অংক, কত টাকার কটি নোট ইত্যাদি বিবরণ দিলো। প্রাপ্ত থলে ও তার মধ্যে রক্ষিত টাকার সাথে তার বিবরণ মিলে গেল। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রমাণ বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও আলামতের ওপর ভিত্তি করে থলেটি উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সংসারের মালপত্র নিয়ে বিবাদ বাধলে বিচারক সহজেই নির্ধারণ করতে পারবেন, টুপি, পাগড়ি, লুঙ্গি, জামা প্রভৃতি স্বামীর এবং শাড়ি, গয়না ইত্যাদি স্ত্রীর মাল। একটি ছেলে বা মেয়ে বালিগ হয়েছে কিনা তা প্রাসঙ্গিক দৈহিক আলামতের মাধ্যমে সহজেই নির্ণয় করা যায়।

হদ ও কিসাস বহির্ভূত বিষয়ে আলামতের ভিত্তিতে মোকদ্দমার ফায়সালা করা যাবে। হদ ও কিসাসের বেলায় শুধু আলামতের ভিত্তিতে নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে শাস্তি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ অথবা অপরাধীর স্বীকারোক্তি বিদ্যমান থাকতে হবে। আলামত অপরাধ প্রমাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।[২১৯]

আলামত দু'ভাগে বিভক্ত। শক্তিশালী আলামত ও দুর্বল আলামত। শক্তিশালী আলামত দ্বারা নিশ্চিত ধারণা লাভ করা যায়। অপর প্রকারের আলামত শক্তিশালী না হলেও তার দ্বারা প্রবল ধারণা লাভ করা যায়। বিচার্য ঘটনার অনুকূলে যদি উক্ত আলামত ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ বর্তমান না থাকে অথবা উক্ত আলামতের বিপরীতে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে তখন বিচারক উক্ত আলামতের ভিত্তিতে মোকদ্দমার ফায়সালা করতে পারবেন।[২২০]

২১৯. আল ফিক্হুল ইসলামী, ৬/৬৪৪।

২২০. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, পৃ. ২৯৪।

www.bjilibrary.com

৪০. শেষ কথা

ইসলামী আইনের মূলনীতি হচ্ছে– একাধিক দোষী ব্যক্তি খালাস পেলেও কোনো নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়। তবে সমাজে আইনের শাসন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সঠিক ও নির্ভুলভাবে যাতে বিচার ফায়সালা করা সম্ভব হয় সেজন্য ইসলামে বাদী বিবাদীর বক্তব্যের সাথে সাথে সাক্ষীদের বক্তব্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। অন্যকথায় বিচারককে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে যারা সেতুবন্ধনের কাজ করেন তারাই হচ্ছেন সাক্ষী। বিচার ব্যবস্থায় যদি সাক্ষ্য ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচারকগণ সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারতেন না। তাই আইন ও বিচার ব্যবস্থায় 'সাক্ষ্য আইন' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাক্ষ্য আইন যদিও মূল আইনের অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করে তথাপিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনও স্বতন্ত্র আইনের মতোই ভূমিকা রাখে।

– o –

www.bjilibrary.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. আহকামুল কুরআন, আবু বকর আহমাদ ইবনু আলী আর রাযী আল জাসসাস আল হানাফী (জন্ম-৩০৫/৯১৭, মৃত্যু-৩৭৫/৯৮০), বৈরূত, দারুল কিতাব, ১৯৯৮ ঈসায়ী।

২. আল জামি' লি আহকামিল কুরআন, আবু আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল আনসারী আল কুরতুবী (মৃত্যু-৬৭১/১২৭২), বৈরূত।

৩. তাফসীরুল কাবীর, ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী আবু আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু উমার (জ-৫৪৩/১১৪৯, মৃ. ৬০৬/১২০৯) বৈরূত, তাবি।

৪. ফাতহুল কাদীর, মুহাম্মাদ ইবনু আলী আশ শাওকানী, বৈরূত, দারুল ফিকর ১৪০৩ হিজরী।

৫. রাওয়িউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকাম, মুহাম্মাদ আলী আস সাবূনী, বৈরূত, ১৪০০ হিজরী।

৬. তাফসীর আল মানার মুহাম্মাদ রশিদ রিযা, বৈরূত, তাবি।

৭. আদওয়াউল বায়ান ফী আয়াতিল কুরআন, মুহাম্মাদ আল আমীন আশ শানকিতী, (মৃ-১৩৯৩ হি)

৮. ফী যিলালিল কুরআন, সাইয়েদ কতুব, (জ-১৯০৬/মৃ.-১৯৬৬ ঈসায়ী) দারুশ শুরুক, বৈরূত।

৯. তাফসীরুল কুরআনিল আযীম– তাফসীর ইবনু কাছীর, আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনু কাছীর আল্ দিমাশকী (মৃ- ৭৭৪/১৩৭২), বৈরূত, ১৯৮০।

১০. আল কাশশাফ, আবু আবদুল্লাহ্ জারুল্লাহ্ আয্ যামাখশারী, মিশর, ১৩৮৫ হিজরী।

১১. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (জ-১৩২১/১৯০৩, মৃ-১৪০০/১৯৭৯) লাহোর, পাকিস্তান।

১২. বায়ানুল কুরআন, আশরাফ আলী থানভী (জ-১২৮০, মৃ-১৩৬২/১৯৪৩) তাজ পাবলিশার্স, দিল্লী, তা, বি।

১৩. মা'আরিফুল কুরআন, মুফতী মুহাম্মাদ শফী (জ-১৩১৪/১৮৯৬, মৃ-১৩৯৬/১৯৭৬) করাচী, পাকিস্তান।

১৪. মা'আরিফুল কুরআন, আল্লামা ইদরিস কান্দালভী মাকতাবাতুল উছমানিয়্যা, লাহোর- ১৯৮২ ঈসায়ী।

১৫. কানযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফ'আল, আল্লামা আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী ইবনু হুসামুদ্দীন আল হিন্দী (মৃ-৯৭৫/১৫৬৭), আলেপ্পো, ১৩৭৯ হিজরী।

১৬. সুনান আদ দারিমী, আবু মুহাম্মাদ আবদিল্লাহ্ ইবনু আবদির রহমান সমরকান্দী আদ দারিমী (জ-১৮১/৭৯৮, মৃ-২৫৫/৮৬৯), মিশর।

১৭. সুনানু আবী দাউদ, সুলাইমান ইবনুল আশআছ আস সিজিস্তানী (জ-২০২/৮১৭, মৃ-২৭৫/৮৮৮), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

১৮. সুনান ইবনু মাজাহ্, আবু আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু মাজাহ্ আল কাযভিনী (জ-২০৭/৮২২, মৃ-২৭৫/৮৮৮), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

১৯. সহীহ্ আল বুখারী, আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল বুখারী (জ-১৯৪/৮০৯, মৃ-২৫৬/৮৬৯), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২০. সুনান আন নাসাঈ, আবু আবদির রহমান আহমাদ ইবনু শুআইব আন-নাসাঈ, (জ-৩৮৪/৯৯৪, মৃ-৩০৩/১০৬৬), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২১. মুওয়াত্তা, ইমাম মলিক (জ-৯৩/৭১১, মৃ-১৭৯/৭৯৮), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২২. মুওয়াত্তা, ইমাম মুহাম্মাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

২৩. মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল (জ-১৬৪/৭৮০, মৃ-২৪১/৮৫৫) মিশর, তাবি।

২৪. শারহু মা'আনিল আছার (তাহাভী শরীফ), আবু জাফর আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সালামা ইবনু আবদিল মালিক আল মিশরী আত তাহাবী (জ-২২৯/৮৪৩, মৃ-৩২১/৯৩৩) বৈরূত, ১৩৯৯ হিজরী।

২৫. আকদিয়াতুর রাসূল, আবু আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইবনুল ফারাজ আল মালিকী আল কুরতুবী (মৃ-৪৯৭/১১০৪) আল কাসীম, বুরাইদা, সৌদি আরাবিয়্যাহ, তাবি।

২৬. আল ফাতওয়া আল হিন্দিয়া-আলমগীরী, সম্রাট আওরঙ্গযীব আলমগীর (জ-১০২৭/১৬১৮, মৃ-১১১৮/১৭০৭) এর নির্দেশে তৎকালিন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ আলিমদের একটি বোর্ড কর্তৃক রচিত, বৈরূত, ১৪০০ হিজরী।

২৭. আল উলাইয়াতুত দীনিয়্যাহ্ ফী আহকামিস সুলতানিয়্যাহ, আবুল হাসান আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবন হাবীব আল মাওয়ারদী (মৃ-৪৫০/১০৫৮) বৈরূত, ১৩৯৮/১৯৭৮।

২৯. আল মুগনী মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্ ইবনু কুদামা (জ-৫৪১/১১৪৬, মৃ-৬২০/১২২৩), কায়রো তাবি (হাম্বলী মাযহাবের ফিক্হ গ্রন্থ)।

২৯. আল হিদায়া, বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবু বাকর ইবনু আবদিল জলীল আল ফারগানী আল মারগীনানী (মৃ-৫৯৩/১১৯৯), দেওবন্দ, ভারত, ১৯৭৯ ঈসায়ী।

৩০. আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ড. ওয়াহ্বা আল যুহাইলী, বৈরূত, ১৪০৯ হিজরী।

৩১. বাদাইউস সানায়ী ফী তারতিবিশ শারা'য়ি, আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনু মাসউদ আল কাসানী আল হানাফী (মৃ-৫৮৭/১১৯১), বৈরূত, ১৪০৩ হিজরী।

৩২. আল ফিকহুস সুন্নাহ্, আস সাইয়্যিদ সাবিক, বৈরূত, ১৪০৩ হিজরী।

৩৩. কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআহ্, আবদুর রহমান আল জাবীরী, বৈরূত, তাবি।

৩৪. আত তাশরীউল জানায়িল ইসলামী, আবদুল কাদের আওদাহ্, বৈরূত, ১৪০৪ হিজরী।

৩৫. আল মওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ, ওজারাতুল আওকাফুল কুয়েতিয়্যাহ, ১৪০০ হিজরী।

৩৬. ফিক্হ আবু বকর (রা), ড. রাওয়াস কিলাজী,

৩৭. ফিক্হ উমার (রা), ড. রাওয়াস কিলাজী,

৩৮. ফিক্হ উসমান (রা), ড. রাওয়াস কিলাজী,

৩৯. ফিক্হ আলী (রা), ড. রাওয়াস কিলাজী,

৪০. ফিক্হ ইবনু মাসউদ (রা) ড. রাওয়াস কিলাজী,

www.bjilibrary.com

৪১. আল ফাতওয়া, তাকিউদ্দীন ইবনু তাইমিয়াহ্, মিশর দারুল কিতাব আল আরাবিয়্যাহ।

৪২. আল কিতাব আল মুসান্নাফ ফিল আহাদীস ওয়াল আছার- মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবা, আবু বকর ইবনু আবী শাইবা, বৈরূত, ১৩৫০ হিজরী।

৪৩. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ইমাম আল মুনযিরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৪. বুলূগুল মারাম আদিল্লাতুল আহকাম, ইবনু হাজার আল আসকালানী, বৈরূত, তাবি।

৪৫. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৯৬ ঈসায়ী।

৪৬. হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৭. ইসলামে বিচার আইন, সম্পাদনা পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪৮. কুরআনী তা'লিমাত, আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী।

৪৯. ইসলামী আইন, আসফ এ,এ, ফৈজী (অনু,) গাজী শামছুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৫০. সাক্ষ্য আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৮ ঈসায়ী।

৫১. সাক্ষ্য আইন, এ টি এম কামরুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাইফুল আলম, খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৭ ঈসায়ী।

৫২. ইসলামী আইন ও বিচার বর্ষ-৪, সংখ্যা-১৪, এপ্রিল-জুন, ২০০৮।

৫৩. কিতাবুত তা'রিফাত আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু জুরজানী (মৃ-৯৭৩), দারুল কিতাব মিশর, ১ম প্রকাশ ১৯৯১/১৪১১ হি.।

৫৪. আল মাওরিদ (এ্যারাবিক-ইংলিশ)- ড. রুহী বালবাকী। দারুল ইল্ম, বৈরূত, ১১তম সংস্করণ, ১৯৯৯ ঈসায়ী।

৫৫. এ্যারাবিক ইংলিশ ডিকশনারী- জর্জ মিল্টন কাওয়ান, স্পোকেন ল্যাংগুয়েজ সার্ভিস, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬ ঈসায়ী।

৫৬. আল হিজাবের মর্মকথা- মুহাম্মাদ খলিলুর রহমান মুমিন, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, ২০০৮ ঈসায়ী।

www.bjilibrary.com

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 984-843-029-0 set

www.bjilibrary.com